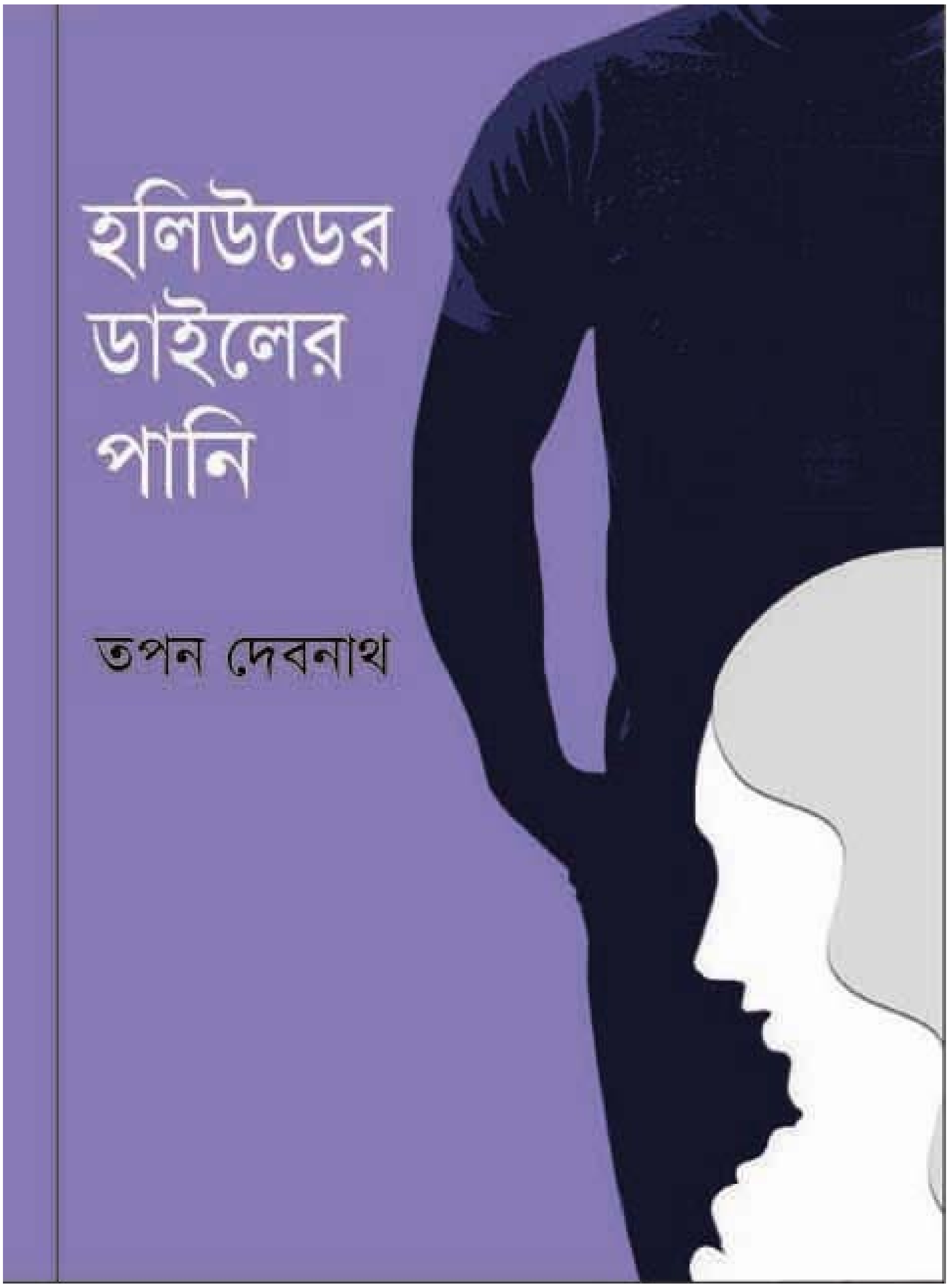

হলিউডের ডাইলের পানি

তপন দেবনাথ

মরুপলাশ গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স
রিয়াদ. সউদী আরব।

হলিউডের ডাইলের পানি
তপন দেবনাথ
(একটি সম্পুর্ণ উপন্যাস)

প্রকাশকঃ

দেওয়ান আবদুল বাসেত
মরুপলাশ গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স, রিয়াদ

প্রকাশকালঃ

পৌষ ১৪১৭বঙ্গাব্দ
০১ জানুয়ারী ২০১১ইং

গ্রন্থস্বত্বঃ
লেখক

সংশোধিত ইন্টারনেট সংস্করণঃ
০১ জানুয়ারী ২০১১ ইং।

প্রচ্ছদ ঃ
নাসিম আহমেদ

কম্পিউটার কম্পোজঃ
নদী, বৈশাখী

শুভেচ্ছা বিনিময়ঃ
বাংলাদেশে – একশত পঞ্চাশ টাকা
দেশের বাহিরে-তিন মার্কিন ডলার

Marupalash Group of Publications, Riyadh
Saudi Arabia

প্রকাশকের কথা

তপন দেবনাথ লিটল বাংলাদেশ, লসএঞ্জেলেস, যুক্তরাষ্ট্র থেকে বহুদিন থেকেই মরুপলাশ এ লেখেন। এবার তিনি তার প্রকাশিতব্য (বইমেলা-২০১১) **হলিউডের ডাইলের পানি** *শিরোনামের উপন্যাসটি বিশ্বব্যাপী মরুপলাশ এর মিলিয়ন পাঠকদের জন্য উপহার দিয়েছেন। অনুরোধ জানিয়েছেন মরুপলাশ গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স যেন গ্রন্থটি নেটে প্রকাশ করে। আমরা এই প্রতিভা প্রখর লেখকের অনুরোধ রক্ষা করলাম। লেখককে তার এমন অনিন্দ সুন্দর মানসিকতার জন্য ধন্যবাদ। আমাদের বিশ্বাস বইটি প্রিন্ট আকারে প্রকাশের সময় সুহৃদ লেখক মরুপলাশ কে মনে রাখবেন।*
-সম্পাদক+প্রকাশকঃ মরুপলাশ, রিয়াদ।

হলিউডের ডাইলের পানি

তপন দেবনাথ

লস এঞ্জেলেস ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট। যুক্তরাষ্ট্রের ব্যস্ততম এয়ারপোর্টগুলোর মধ্যে একটি। এয়ারপোর্টের কাছাকাছি গেলেই দেখা যায় একের পর এক বিমান নামছে এবং উঠছে। কোনো কোনো বিমানকে মনে হয় এই বুঝি মাথার চুল ছুঁয়ে নামবে।

অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছে জয়দেব। আজ ফাইনাল ডে। কোয়ার্টার ফাইনাল, সেমি ফাইনাল পার হয়েছে অনেকদিন আগে। অর্থাৎ আজ আর কিছুক্ষণের মধ্য জয়দেবের পরিবার ইমিগ্রান্ট হয়ে মালেশিয়ান এয়ারলাইন্স যোগে এই এয়ারপোর্টে অবতরণ করবে। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই জয়দেব তার পরিবারের সাথে মিলিত হতে পারবে বলে আশা করছে। প্রতীক্ষার প্রহরগুলো বোধহয় খুবই লম্বা হয়। জয়দেব অস্থির নয়, তবে তার কাছে মনে হয় কোনো কারণে আজ ঘড়ির কাঁটা আস্তে আস্তে ঘুরছে। অন্যদিন সাড়ে এগারটা বাজতে তো এত দেরি হতো না মনে হয়। তবে আজ সময় এত দেরিতে পার হচ্ছে কেন? বারবার সে ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছে। সময় দেখতে আবার তার ভুল হচ্ছে না তো ? ঘড়িটি চলতে চলতে আবার বন্ধ হয়ে যায়নি তো?

পুরনো বন্ধু নির্মল বাবুও জয়দেবের সাথে এয়ারপোর্টে যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু কাজ থেকে ছুটি নিতে পারেনি বলে সে যেতে পারেনি। নির্মল বাবু সাথে থাকলে জয়দেবের এতটা একা একা লাগতো না। কয়েক বছর ধরে তারা খুব ভালো বন্ধু। যে কোনো প্রয়োজনে জয়দেব নির্মল বাবুর এবং নির্মল বাবু জয়দেবের সাহায্য নেয়।
জয়দেব তার পরিবারের জন্য আবেদন করেছিলো কয়েক বছর আগে। যখন সব কাজ শেষ হয়েছে বলে তার মনে হয়েছে তখনই আবার নতুন করে আর একটা ঝামেলা বেধে যেত। এভাবে কাজটা যেন শেষ হতে চাচ্ছিল না। এই কাগজ জমা দিয়েছে তো সে কাগজ লাগবে, সে কাগজ জমা দিলে অন্য আর একটি কাগজ লাগবে। যে কাগজ জোগাড় করতে সাত দিনের বেশি সময় লাগার কথা নয় সে কাগজের জন্য সময় দিতো ২/৩ মাস। দিন যায় তো মাস যায় না, মাস যায় তো বছর যায় না। এভাবে আবেদন করার চার বছর, নয় মাস, উনত্রিশ দিন পর আজ জয়দেবের পরিবার আসছে।

ঠিক কতবার জয়দেবের পরিবারকে ঢাকা ইউএস এ্যাম্বাসিতে যেতে হয়েছে সে কথা আজ আর জয়দেবের মনে নেই। এক একবার এ্যাম্বাসিতে যাওয়া মানে এক একটা ছোটখাটো যুদ্ধ আর কী। খরচের হিসাব বাদ দিলেও কে নিয়ে যাবে, কোথায় থাকবে সে ছিল এক নিদারুণ যন্ত্রণা। এরপর যখন এ্যাম্বাসি থেকে একটি কাগজ ধরিয়ে দিয়ে বলতো আবার ঐ তারিখে এসো তখন মনে হতো জীবনে সে জানি কত পাপ করছে। তা না হলে হয়ে যাওয়া কাজ নিয়ে এত বিলম্ব কেন?

বহুবার ধৈর্যহারা হয়ে গিয়েছিলো জয়দেব। ধৈর্যহারা হয়ে গিয়েছিলো তার পরিবারও। বছরের পর বছর একই কাজ করতে তারা বিরক্ত হয়ে গিয়েছিলো। মাঝপথে থেমে যাওয়ার কোনো উপায় ছিলো না। তাহলে হয়তো সবই হারাতে হতো। যেহেতু কিছু করার নেই সেহেতু সব মেনে নিয়েই অগ্রসর হতে হয়েছিলো।

ঢাকা থেকে রওয়ানা দেওয়ার আগেও স্ত্রীর সাথে তার কথা হয়েছিল যে তারা আর একটু পরেই বিমানে উঠবে। মালেশিয়া থেকেও মেয়ে প্রিয়ন্তি জয়দেবের মোবাইল ফোনে কয়েক সেকেন্ড কথা বলেছিল যে তারা আর একটু পরেই বিমানে আরোহণ করবে।

এয়ারপোর্টের ডিসপেস্ল বোর্ডে লেখা উঠেছে যে মালেশিয়ান বিমান যথাসময়ে অর্থাৎ বেলা সাড়ে এগারটায় অবতরণ করবে। এখন বাজে এগারটা। আর মাত্র ত্রিশ মিনিট। সেকেন্ডে হিসেব করলে আঠারোশ সেকেন্ড। এরপর ইমিগ্রেশনের কাজ শেষ করতে যতক্ষণ লাগে। সব কথা সে আগেই বলে দিয়েছে। শুধু মনে থাকলেই হয় এবং কোনো কারণে ভয় না পেলেই হয়। এরচেয়ে কত বোকা লোকজন চলে আসছে প্রতিদিন। ছেলেমেয়েরা তো কমবেশি পড়ালেখা জানেই। মধুমিতাও কিছু কিছু ইংরেজি জানে। সাহস করে কথা বলতে পারলে কোনো সমস্যা হবার কথা নয়। ফোনে জয়দেব সবাইকে প্রয়োজনীয় ইংরেজি শিখিয়ে দিয়েছিল। কী কী করতে হবে তা একাধিকবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলো। যদি এই ত্রিশ মিনিটের মধ্যে কোনো অঘটন না ঘটে তবে জয়দেবের পরিবার ত্রিশ মিনিট পর আমেরিকার মাটিতে পা রাখবে। ভাবতে তার খুব ভালো লাগছে। আপাতত এরচেয়ে সুখকর আর তার কাছে কিছু নেই। কতগুলো বছর যে প্রতীক্ষার প্রহর গুনতে গুনতে কেটে গেল সে কথা এখন আর সে স্মরণ করতে চায় না। কী হবে আর সেসব যন্ত্রনার কথা স্মরন করে ?
চোখের পলকে না হলেও সময়ের নিয়মে সময় চলে গেছে। হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে জয়দেব দেখলো সাড়ে এগারটা বাজে এবং ডিসপেস্ল বোর্ডের দিকে তাকিয়ে দেখলো মালেশিয়ান বিমান অবতরণ করেছে। সতর্ক হলো জয়দেব। একটা লম্বা নিঃশ্বাস ত্যাগ করলো সে। তার কাছে মনে হলো বিরাট একটা বোঝা বোধহয় মাথা থেকে নেমে গেছে। তাদের বের হতে এখনো অনেকক্ষণ সময় লাগবে। তবুও সতর্ক নজর রাখতে হবে। তারা বের হয়ে যদি জয়দেবকে দেখতে না পায় অথবা জয়দেব তাদেরকে দেখতে না পায় তবে ঝামেলার শেষ থাকবে না। কেঁদে-কেটে তারা হয়তো একাকার করে ফেলবে।

প্রচুরসংখ্যক লোক তাদের প্রিয়জনকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য অপেক্ষা করছে। কে কোন এয়ারলাইন্সে এসেছে সেটা যাত্রীদের দেখে বোঝার কোনো উপায় নেই বা তা জানার কোনো দরকারও নেই। তারপরেও কোনো যাত্রী জয়দেবের দৃষ্টিসীমানার মধ্যে এলেই বুকে কেমন যেন একটা ধাক্কা লাগে। এই বুঝি তার পরিবার এলো। লাইন ধরে বের হয়ে যাওয়া প্রতিটি যাত্রীকে সে পরখ করে দেখছে দৃষ্টির আড়ালে তারা যেন বের হয়ে না যায়।
অনেকক্ষণ পার হয়ে গেছে। যে কোনো সময় জয়দেবের পরিবার বের হয়ে আসতে পারে। পার্কিং লটে সারাদিনের জন্য সে গাড়ি রেখে এসেছে। আজ আর কাজে যাবার সময় হবে না। তা নিয়ে ভাবছে না জয়দেব। প্রিয়জনের আগমন নিয়ে কথা। আজ ট্যাক্সি না চালাতে পারলেও ৫০ ডলার ভাড়া ঠিকই দিতে হবে। সেটা নিয়েও জয়দেব চিন্তিত নয়। এক ধরনের নিজের গাড়িতে করে পরিবারকে বাসায় নিয়ে যাওয়াটা কম কথা নয়। কম কথা হতেই পারে না। নিজের পরিবার বলে কথা। নিজের স্ত্রী। নিজের ছেলেমেয়ে। এর চেয়ে কোনো গুরুত্বপুর্ণ কাজ তার কাছ নেই এই মুহূর্তে।

এই শহরে জয়দেব একজন পাক্কা ড্রাইভার। গত কয়েক বছরে বহু পরিবারকে সে তাদের গন্তব্যে পৌঁছে দিয়েছে আর হৃদয়ের গভীরে এক ধরনের আশা, আগ্রহ হয়েছে কবে সে তার নিজের পরিবারকে গাড়িতে করে বাসায় নিয়ে যাবে। আজ সে দিন। আর মাত্র কয়েক মিনিট। এমনকি কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে তারা বের হতে পারে। এক সময় না এক সময় প্রতীক্ষার প্রহর শেষ হবেই। হতে বাধ্য। মনে মসে ভাবে জয়দেব ।

জয়দেবের স্ত্রী মধুমিতা, এক মেয়ে প্রিয়ন্তি, দু'ছেলে জয়ন্ত ও পড়ন্ত ট্রলি ঠেলতে ঠেলতে উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে চারদিকে তাকাচ্ছে আর সামনের দিকে হাঁটছে। তারা অনেকটা ভয়ার্ত। হাঁটার গতি যতটুকু থাকার কথা ততটুকু নেই। তাদের হাঁটার গতি মন্থর হওয়াতে পেছনের লোকেরাও আগাতে পারছে না।
জয়দেব প্রথম তার পরিবারের সদস্যদের দেখতে পায়। তখনও তারা নিরাপত্তা বেষ্টনীর মধ্যে। দর্শনাথীরা সেখানে যেতে পারে না।

-মধুমিতা, আমি এখানে। জোরে চিৎকার দিয়ে জয়দেব তার ডান হাত উপরে তুললো। তার বুক ধড়পড় করতে লাগলো। পরিবারের সবাই জয়দেবকে দেখতে পেলো। কয়েকজন লোক জয়দেবের দিকে তাকালো। এটা দেখতে পেয়ে নিচের দিকে তাকালো জয়দেব।

ভদ্রলোকের দেশ। এতজোরে চিৎকার দেওয়া ঠিক হয়নি বুঝতে পারে জয়দেব। না দিয়েই বা কী করবে সে। তাকে না দেখে তার পরিবার উদ্বিগ্ন। অন্যেরা তা কী বুঝবে। যাক, ইংরেজিতে তো দিইনি। দিয়েছি বাংলায়। বাংলা আর এখানে কে বুঝবে। আমাকে না দেখলে তারা হয়তো কেঁদেই দিতো। আমি যে এখানে আছি তারা তো তা জানে না। যতক্ষণ আমাকে না দেখবে, ততক্ষণ তাদের শান্তি নেই। না হয় একটু জোরেই চিৎকারটা দিয়েছি। সাত-সাড়ে সাত ভাবতে ভাবতে জয়দেবের পরিবার তার কাছাকাছি চলে এসেছে। আর কয়েক পা এগুলেই জয়দেব তাদের ছুঁতে পারবে।

অবশেষে ফাইনাল। জয়দেবের পরিবার তার কাছে চলে এসেছে। উদ্বিগ্নতাগুলো এখন পিছু হটছে। আর কোনো প্রতীক্ষা নেই। তারা এখন জয়দেবের সামনে। ধন্যবাদ ভগবান। তোমাকে অশেষ ধন্যবাদ। ভালোয় ভালোয় তারা চলে এসেছে। মনে মনে ভগবানকে ধন্যবাদ জানিয়ে জয়দেব সামনের দিকে আগাতে চেষ্টা করছে।

-বাবা! এক সাথে জয়দেবের তিন ছেলেমেয়ে তাকে ডাক দিলো। ট্রলি রেখে তারা এসে পিতাকে জড়িয়ে ধরলো। জয়দেব একসাথে তিন সন্তানের কাকে রেখে কাকে আদর করবে বুঝতে না পারে সবার পিঠে হাত বুলিয়ে দিলো।

ইমিগ্রেশনের লোকেরা তো বছর বছর নতুন গাড়ি বদলের মতো বৌ বদল করে। ওরা কী বুঝবে বাঙালির পারিবারিক বন্ধন জিনিসটা কী? কী কষ্টটা না দিলো আমাকে। দেখ ব্যাটারা, পারিবারিক মিলন কাকে বলে? মনে মনে ইমিগ্রেশনের একুশ গোষ্ঠী উদ্ধার করলো জয়দেব।

দীর্ঘপথ ভ্রমণে মধুমিতার কপালের সিঁদুর লেপ্টে গেছে। মাথায় ঘোমটা দিয়ে ডান হাতে সে শাড়ির আঁচল ধরে রেখেছে। এরই মধ্যে সে স্বামীর পা ছুঁয়ে প্রণাম করেছে। ছেলেমেয়েরাও করেছে।

আনন্দঘন পরিবেশ। এর চেয়ে আনন্দ আর হয় না। লম্বা লম্বা দীর্ঘশ্বাসের অবসান হয়েছে। জয়দেব আনন্দাশ্রুতে ভাসছে। নিজের স্ত্রী এবং সন্তান বলে কথা। তারা এখন তার কাছে চলে এসেছে। এর উপর আর কোনো আনন্দ নেই।

-চল, গাড়ির কাছে চল। জয়দেব সবাইকে হাত দিয়ে বাইরে যেতে ইশারা করলো। নিজে একটা ট্রলি ঠেলতে শুরু করলো। স্ত্রীর চোখের দিকে তাকালো সে। ক্লান্ত হলেও মধুমিতা খুশি। গভীর পরিতৃপ্তি তার চাহনিতে।

স্বামীর কাছাকাছি হাঁটছে মধুমিতা। অনেকটা গা ঘেঁষে। আহা! কত বছর লোকটা একটু আদর-সোহাগ পায় না। এখন আর সমস্যা কী? এসেই তো পড়েছি। গভীর দৃষ্টিতে মধুমিতা স্বামীর চোখের দিকে তাকালো।

-এবার ঘোমটা খোলো মধু। এখানে এসবের দরকার নেই। বললো জয়দেব।

-কেন? ঘোমটা খুলমু কেন? দেখেন না লোকগুলি কেমন ফ্যালফ্যাল কইরা চাইয়া থাকে? সলজ্জ বললো মধুমিতা, যেন সে নতুন বধূ।

-তুমি যে রূপবতী সে জন্য তোমার দিকে চেয়ে থাকে না। চেয়ে থাকে তোমার ঘোমটা দেওয়া দেখে। এরা এটা নূতন দেখছে তো? স্ত্রীকে বললো জয়দেব।

-হুনছি এইডা ধনীর দেশ। মাইয়া মাইনষের গায়ে কাপড়-চোপড় এত কম ক্যান? ওরা কী গরিব হইয়া গেছে? মৃদু হেসে বললো মধুমিতা।

অট্টহাসি করলো জয়দেব। -সে জন্যই তো ওরা তোমাকে দেখে হাসে। এত কাপড়-চোপড় তুমি কোথায় পেলে। তুমি যখন আমার পা ছুঁয়ে প্রণাম করছিলে লম্বা মতো ঐ চিকনা মেয়েটা তোমার কাজ কারবার দেখে হাসছিল, বললো জয়দেব।

–হাসুক। কান্দে তো নাই। বেয়াদপ মাইয়া মানুষ, লাজ শরমের বালাই নাই। সব উদাম কইরা রাখছে। এবারো মৃদু হাসল মধুমিতা।

– উদামের আর দেখছ কী? কেবল তো শুরু। এবার মাথার ঘোমটা খোলো।

–খুললাম। আর কিছু খুলতে অইবো? মাথা থেকে কাপড় নামিয়ে মধুমিতা শরীরে প্যাঁচিয়ে নিলো। মনে হয় সে তা অনিচ্ছাকৃত করেছে । বাঙালি হিন্দু নারীর ঘোমটা পরা তো অশোভন কিছু নয়, অন্যজনের কাছে তা যতই খারাপ লাগুক।

হাঁটতে হাঁটতে তারা সবাই গাড়ির কাছে চলে এলো। তিনতলায় গাড়ি পার্ক করা দেখে অবাক হলো তারা। বিল্ডিংয়ের তিনতালায় গাড়ি কী করে উঠলো। অবাক কান্ড তো।

পকেট থেকে চাবি বের করে জয়দেব গাড়ির দরজা খুললো। পেছনে সব ক'টি লাগেজ ঢুকালো সে। ছেলেমেয়েদের পেছনে এবং স্ত্রীকে সামনের সিটে বসতে বললো। স্ত্রীর সিটবেল্ট বেঁধেদিল জয়দেব। সে সাথে আরো কিছুর ছোঁয়া পেল।

তিনতলা থেকে আস্তে আস্তে ঘুরতে ঘুরতে গাড়িটি রাস্তায় নেমে এলো।

–এটি কী তোমার গাড়ি বাবা? প্রিয়ন্তি প্রশ্ন করলো।

–আমার নয়। ভাড়ার গাড়ি। জবাব দিলো জয়দেব।

–তুমি গাড়ি চালাইতে শিখলা কবে? বল নাই তো কোনোদিন? মধুমিতা স্বামীর গাড়ি চালানো দেখছে। অবাক হয়ে সে স্বামীর হাতের দিকে তাকাচ্ছে। কীভাবে সে স্টিয়ারিং ডানে-বামে ঘোরাচ্ছে।

–হলো তো অনেক দিন। এখন এটাই আমার পেশা। জবাব দিলো জয়দেব।

–তার মানে তুমি এখন ট্যাক্সি চালাও? ট্যাক্সিওয়ালা?

–অবাক হলে মনে হয়? ট্যাক্সি চালানো কী কোনো কাজ নয়?

–কাজ না কে কইলো? ফোনে না বলতা তুমি বিমান চালাও। সোন্দর সোন্দর মাইয়া মানুষগো বাড়িতে পৌঁছাইয়া দেও। বিয়া-শাদি আবার কর নাই তো? হুনছি এইখানে আইসা সবাই একখান কইরা বিয়া করে।

–ঠিকই শুনেছ। আমিও একটা করেছি। কারো একটা বিল্ডিং থাকলে কী আর একটা করে না? সহাস্যে জবাব দিলো জয়দেব।

ছেলেমেয়েরা অবাক হয়ে দু'পাশে দেখছে। এয়ারপোর্ট থেকে গাড়ি লস এঞ্জেলেসের দিকে ছুটছে।

–তার মানে তুমি আর একটা বিয়া করছো? তোমার হেই বৌ কই? মধুমিতার কথায় সামান্য ঝাঁঝালো সুর।

–বৌ বাসায় ভাত রান্না কওে তোমার জন্য অপেক্ষা করছে। তোমার চুল ছিঁড়বে বলে সে অপেক্ষা করছে। হো হো করে হাসলো জয়দেব।

–তাইলে আমারে আনলা কেন? তেতে যাচ্ছে মধুমিতা।

–আমি আনলাম কোথায়? তোমরাই তো এলে।

–তাইলে গাড়ি থেইক্কা নামাইয়া দাও। বাড়ি চইলয়া যাই।

–তুমি কী সদরঘাট এসে লঞ্চ থেকে নামলে নাকি যে আবার আর এক লঞ্চে ভোলা চলে যাবে? কোথায় এসেছো বুঝতে পারোনি এখনো?

কিছুটা থতমত খেলো মধুমিতা। সে ভুলেই গিয়েছিস যে সে আমেরিকা এসে গেছে। জয়দেব গাড়িতে টার্ণ নিলেই মধুমিতা তার হাত চেপে ধরে। তার মনে হয় গাড়ি বুঝি উল্টে গেল। অন্যসব গাড়ি এসে বুঝি তাদের গাড়ির উপর হুমড়ি খেয়ে পড়লো।

ক্রমান্বয়ে শহরের দিকে আসতেই এবার টার্ণ নিলে হলিউডের সাইনটি তাদের নজরে পড়ল। প্রিয়ন্তি, জয়ন্ত ও পড়ন্ত হলিউড, হলিউড বলে চিৎকার দিলো। হলিউড লেখা এ সাইনটি পর্যটকদের ছবি তোলার জন্যে খুব পছন্দের জায়গা। আমেরিকা তথা গোটা বিশ্বের বিনোদনপ্রিয় লোকদের কাছে হলিউড একটি প্রিয় নাম। নানাবিধ কারণেই যে হলিউড বিখ্যাত একথা তারা আগে থেকেই জানে ।

–আমরা হলিউডের পাহাড় দেখতে যাব বাবা। প্রিয়ন্তি বললো।

–আগে বাসায় তো যাই। জয়দেব জবাব দিলো।

–মাইকেল জ্যাকসনের বাড়ি কতদুর বাবা? জয়ন্ত প্রশ্ন করলো।
–দুর আছে। তোমরা এতসব জানো কী করে? জয়দেব খানিকটা অবাক হলো।
–বাবা আমেরিকা থাকে আর ছেলেমেয়েরা খবর জানবো না? বাংলাদেশ এখন আর বাংলাদেশ নাই। অনেক বদলাইয়া গেছে। পোলাপাইন এখন সব খবর রাহে। রিমোট ধইরা টিপ দিলেই টিভিতে সারা দুনিয়া দেখা যায়। হলিউড দেখা যাইবো না? মধুমিতা জবাব দিলো।

গাড়ি ফ্রিওয়ে থেকে এবার রাস্তায় নেমে এসেছে। এখন গাড়ির গতিও অনেক কমে গেছে। চারপাশে দালানকোঠা দেখে অবাক হচ্ছে তারা। ছবির মতো সব সাজানো। সারি সারি গাড়ি আর গাড়ি, অগণিত রাস্তা অথচ একটু কালোধোঁয়া নেই। হর্ণের শব্দ নেই। চুপচাপ বোবার মতো গাড়িগুলো পাশ কেটে যাচ্ছে। কোনো হুড়াহুড়ি, হুলস্থুল নেই।

বাসার সামনে এসে গাড়ি থামলো। রিমোট কন্ট্রোল টিপ দিতেই বড় একটা গেট আপনি আপনি খুলে গেলো। অবাক কান্ড! কেউ এসে গেট খুলতে হলো না? গাড়ি নিয়ে জয়দেব বিল্ডিংয়ের ভেতরে ঢুকে গেল।
–এটা কী করে হলো বাবা? পড়ন্ত প্রশ্ন করলো।
–কোনটা? জয়দেব ছেলের মুখের দিকে তাকাল।
–আপনা আপনি গেট খুলে গেল একদম চিচিং ফাঁক এর মতো।

হো হো করে হাসলো জয়দেব। আপনা-আপনি খোলেনি বাবা, আমি রিমোট কন্ট্রোল টিপ দিয়েছি। এখন টেনে দেখ, খুলতে পারবে না।

সবগুলো লাগিজ নামিয়ে জয়দেব লিফটে তুললো। বাকিরা কোনো কাজ করছে না। তারা শুধু দেখছে জয়দেব কী করছে।

ওরা আসার আগেই জয়দেব এক বেডরুমের একটি বাসা ভাড়া করে তাতে জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সব কিনে রেখেছে। বাসা ভাড়া নিলে অনেক কিছু আগে থেকেই পাওয়া যায়, মানে বাসায় রেফ্রিজারেটর দেওয়া ছিল, চুলা কিনতে হল না। বাসায় কার্পেট দেওয়াই আছে। ক্লোজেট আছে, যাতে করে আলমারির দরকার হবে না। আধুনিক নাগরিক সুবিধার সবই আছে।

মধুমিতা একটা সোফায় বসল। ছেলেমেয়েরা ঘুরে ফিরে এটা-সেটা দেখছে।
–জানো, প্রিয়ন্তি মাইয়াডা হইল একটা বজ্জাতের হাড্ডি। আমি এত কষ্ট কইরা তোমার জন্য কিছু পিঠা বানাইয়া আনলাম। এয়ারপোর্টে সুটকেসগুলি এক্সরে করলো, কোনো কিছু তাগো অসুবিধা হইল না। কেবল অসুবিধা হইল কয়টা পিঠা। মোটকা মতো কালা একটা মহিলা কইলো কিপইট, কিপইট। বজ্জাত মাইয়াডা পিঠার পোটলাটা তার হাতে দিয়া দিলো। কালা মাইলাডা সেইডা বাক্সের মধ্যে রাখলো। কিপইট জিনিসটা কি? প্রিয়ন্তিই বা কী বুঝলো?

হো হো করে হাসলো জয়দেব। রান্না করা কোনো জিনিস এদেশে আনা নিষেধ। মহিলা যা বলেছে সেটা ঠিকই বলেছে আর প্রিয়ন্তি যা করেছে সেটাও ঠিক করেছে। পিঠার প্যাকেটটা রেখে দিতে বলেছে আর সেটা প্রিয়ন্তি বুঝতে পেরেই মহিলার হাতে দিয়ে দিয়েছে।
–আসতে না আসতেই ইংরাজি বুইঝা গেল? আমরা ইংরাজি জানি না এই কথা বইলাই তো পোটলাটা নিয়ে আসতে পারতাম। আমার মা বাড়ি থেইক্কা কালিজিরা চাউল পাঠাইছিল। সেই চাউলের পিঠাগুলি...
–তুমি যে ইংরেজি জানো না এ-কথাও তাদের ইংরেজিতে বলতে হতো, তাই না? তুমি ইংরেজি না জানলে ওরা বাংলা জানে এমন লোক ডেকে নিয়ে আসতো।
–তাইলে তো আরো বালা অইতো। কালিজিরা চাউলের গুড়া, খাজুর মিঠাই আর গাছের নারিকেলের পিঠা কত স্বাদ তারে একটা দিয়া কইতাম টেস্ট করেন একটা। অগরে একটা কইরা দেন। দেখুক বাংলাদেশের পিঠা কেমন স্বাদ। রাইখা যখন দিছে পরে তো ঠিকই খাইছে।
–ওরা ওগুলো খাবে না মধু, ওগুলো ফেলে দিয়েছে।
–স্বামীর দরদ ওরা বুঝবে কী? বুঝলে কী আর এই সামান্য জিনিস রাখে? শূন্য দৃষ্টিতে জয়দেব স্ত্রীর মুখের দিকে তাকাল। সে বুঝতে পারছে দেশ থেকে বানিয়ে আনা পিঠার সাথে মধুমিতার অন্তরের একটি ছোঁয়াও ছিল। ছিল তাতে হৃদয় নিঙড়ানো ভালোবাসা। কিন্তু এদেশের আইনের কাছে সে ভালোবাসা টেকেনি।

–স্বামীর দরদ ওরা না বুঝে না বুঝুক, তুমি বুঝলেই হয় মধুমিতা। হলিউডের ডাইলের পানি পেটে পড়লে স্বামীর কথা আবার ভুলে যেও না যেন। অস্ফুট বললো জয়দেব। মধুমিতা তা বুঝতে পারলো না।
–কিছু মনে হয় কইলা তুমি। স্বামীর আরো কাছে ঘেঁষে বসল মধুমিতা।
স্ত্রীকে ঝাপটে ধরলো জয়দেব। বুকের মধ্যে চেপে ধরে একটা মৃদু চাপ দিয়ে ছেড়ে দিলো।
–হায় ভগবান! দিনের বেলা? তোমার কী লজ্জা-শরম নাই নাকি? তো তোমার বউ কই? তারে কে দেখছি না। পালাইছে আমার ভয়ে?
–তোমার আসার কথা শুনে তোমার ভয়ে পালিয়ে গেছে। মৃদু হাসল জয়দেব।
–যা শুনেছি তাইলে সব সত্য? এইখানে আইসা লোকে ২/৩টা বিয়া করে?
–আমিও শুনেছি, দেশে স্ত্রী রেখে এলে তারা এখানের স্বামীর পাঠানো টাকা দিয়া পর পুরুষের সাথে ড্যাং ড্যাং করে। সিনেমায় যায়, রেস্টুরেন্টে খায়। সুযোগ পেলে আবার পর পুরুষের হাত ধরে চলেও যায়।
–রাম, রাম, রাম এইসব কী বাজে কথা? তুমি আমার মধ্যে এমন কিছু দেখছো কখনো? কোন ব্যাটা কইছে তোমারে এইসব?
–এখানে থেকে তো আর দেশ দেখা যায় না, পত্র-পত্রিকায় খবর পাওয়া যায়। তুমিও তো আর দেশে থেকে এখানে দেখতে পাওনি। যারা বলেছে তারা বছরে ক'বার আমেরিকা যাওয়া-আসা করে? নাকি স্যাটেলাইটে দেখে?
–তার মানে তুমি বিয়া কর নাই? সব ভুয়া কথা? বানানো কথা তোমার?
–কী আশ্চর্য! বিয়ে না করলে এ তিন তিনটি সন্তান হলো কী করে? তুমি তো আর সন্তানসহ আমাকে বিয়ে করোনি?
–সে তো বিয়ে করেছো আমাকে? রাম, রাম, কী বলে, তিন সন্তানসহ...
–তোমাকে করেছি, আবার প্রয়োজন হলে তোমাকেই করবো। লাইসেন্সের মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে আবার নবায়ন করে নেয় না মানুষ?
মধুমিতা উঠে স্বামীর বুকের মাঝে মাথা রাখলো। লোকটা আগের মতোই আছে, একটুও বদলায়নি। কপালের লেপ্টে যাওয়া সিঁদুর জয়দেবের জামায় লাগলো। জয়দেব তা দেখলো। লাগুক। স্ত্রীর ভালোবাসার সিঁদুর। জামায় কেন? জামা ভেদ করে কলিজায় লাগুক। অর্ধযুগের বিরহের আজ শেষ দিন। প্রয়োজন হলে হৃদয় ফুটো করে জয়দেব রক্ত দিয়ে স্ত্রীর কপালে লাল দাগ দিয়ে রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক করে নেবে। মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ দেবে-কখনো মেয়াদ উত্তীর্ণ হবে না। অর্থাৎ নো এক্সপায়ার ডেট।
দুপুর গড়িয়ে গেছে। কারো এখনো খাওয়া হয়নি। সকালে এয়ারপোর্ট যাবার আগে জয়দেব সকলের জন্য রান্না করে রেখে গিয়েছে। রান্নাবান্না সে ভালোই পারে। এদেশের কঠিন বাস্তবতার মধ্যে তা তাকে শিখতে বাধ্য করেছে।
–মধু, একজন একজন করে স্নান সেরে আসো। খাওয়া-দাওয়া করে একটা লম্বা ঘুম দাও। তারপর বিকালে সব কথা হবে।
–তুমি স্নান করছো? মধুমিতা স্বামীর দিকে তাকিয়ে বলল।
স্ত্রীর কথায় কোনো জবাব না দিয়ে জয়দেব একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করল। গত অর্ধযুগে কেউ তাকে এমন করে স্নান করার কথা বলেনি। আসলে স্ত্রী একটা... স্ত্রী একটা... স্ত্রী একটা কী জিনিস ঠিক বলতে পারছে না জয়দেব। অর্ধাঙ্গিনী, লাইফ পার্টনার, সারা জীবনের সাথী, জীবন-মরণের বন্ধু এগুলো অনেক পুরনো কথা। হ্যাঁ, পেয়েছে জয়দেব, স্ত্রী হচ্ছে বিবাহিত জীবনে শান্তির সাদা পায়রা। এটাই হবে। মাত্র কিছুক্ষণ আগে স্ত্রীর আগমনে জয়দেবের ধুসর জীবনটা কেমন বদলে শান্তি নিকেতন হয়ে গেল।
–তুমি কী একলা একলা কথা কও নাকি? স্ত্রীর কথায় সম্বিত ফিরে পায় জয়দেব।
–কই না তো। যাও, সবাই স্নান করে এসো একসাথে খাব।
–বললে না তুমি স্নান করছো কিনা? না করলে তুমি আগে যাও।

–আমি সকালেই করেছি। সকালে নাস্তা করেই রান্না করেছি। রান্না করে স্নান সেরেই এয়ারপোর্টে চলে গেছি।
–তুমি কষ্ট করে রান্না না করলেও পারতা। আমরাই তো করতে পারতাম। তাইলে তুমি খাইতে বস। ওরা স্নান করে আসুক।
–প্রথম দিন সবাই একসাথে খাই। আসুক না ওরা।
–রাত্রে তো সবাই একসাথে খাইতে পারবা। তুমি খাও আগে। আমি তোমারে বাইরা দিই। না থাক। স্নান না কইলা তোমারে খাইতে দিমু? গত দুইদিন তো দিনরাইত কোনখান দিয়া গেছে। তুমি একটু বস, আমি একটা ডুব দিয়া আসি।
হো হো করে হাসল জয়দেব। ডুব দিবা যে, পুকুর পাবে কোথায়?
লজ্জা পেল মধুমিতা–আমরা গ্রামের মানুষ তো স্নান বলতে পুকুরই বুঝি।
–আস্তে আস্তে সব ঠিক হয়ে যাবে। প্রথম প্রথম এমন উল্টা-পাল্টা আমারও হয়েছিল। পরে সব ঠিক হয়ে গেছে। প্রথম আমিও বলতাম ডুব দিয়া আসি।
মধুমিতা বাথরুমে প্রবেশ করার পর জয়দেব ছেলেমেয়েদের ডাক দিলো। ঘরের সাধারণ বিষয়গুলো যেমন–ফোন করা, দরজা আটকানো, বেসিন ব্যবহার, গরম জল, ঠন্ডা জল, হাঁটাচলা, আস্তে আস্তে কথা বলা, টিভির সাউন্ড কতটুকু থাকবে, কোনো আকস্মিক বিপদে কী করবে ইত্যাদি বিষয়গুলো সে বুঝিয়ে দিলো।
কয়েক মিনিটের মধ্যেই মধুমিতা স্নান করে বের হলো।
–তোরা একজন একজন করে স্নানে যা। আমি তোর বাবাকে খেতে দিই।
–আমি আগে যাই মা? প্রিয়ন্তি বলল।
–যা। ঠান্ডা জল, গরম জল দেখিস কিন্তু।
জয়দেব হাত মুখ ধুয়ে আসার পর মধুমিতা তাকে খাবার দিলো। জয়ন্ত ও পড়ন্ত বেডরুমে এটা সেটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছে।
–আমাকে ছাড়া তোমার এতগুলো বছর কাটলো কী কইরা? মধুমিতা বললো।
–আমাকে ছাড়া তোমার যেভাবে কেটেছে। তোমাকে ছাড়া আমার সেভাবেই কেটেছে। খাবার মুখে দিতে দিতে জয়দেব বলল।
–তোমার সাথে কথায় পারবে এমন কোনো মানুষ আছে দুনিয়ায়? তোমার রান্না করা ভাত তোমারে বাইড়া দিলাম। লাভটা কী হইল?
–এত হতাশ হলে কেন? এলে তো মাত্র কয়েক ঘণ্টা। রান্না কী করতে পারবে না? এখন থেকে তো তুমিই রান্না করবে। আমার ছুটি। পুরুষের কাজ কী রান্না-বান্না করা? দিনের একটা বড় সময় চলে যায় এ-রান্নাবান্নার কাজে। আজ থেকে লে-অফ!
মধুমিতা জয়দেবের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে। সে আলতো করে স্বামীর মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। মোমের মতো যেন গলে যাচ্ছে জয়দেব। ৩ সন্তানের পিতা হবার পরে আজ তার মনে হচ্ছে–আসলে যৌবনে স্ত্রীর চেয়ে আপন কেউ নেই। অর্ধযুগের বিরহকাতর জীবনে আজ কী প্রশান্তি। দেশান্তরি মানুষের জীবনটাকে কীভাবে বিষময় করে তোলে। পরিবারের সবাইকে নিয়ে যারা দেশান্তরি না হতে পারে তাদের জীবনটা আমার মতোই এমন ছন্নছাড়া, টানাপোড়েনের। দেহটা বিদেশে থাকলেও মনটা পড়ে থাকে স্বদেশে। আমি বৈধ এবং আমেরিকা থাকি বলেই না স্ত্রী-সন্তানদের আনতে পেরেছি। যারা বৈধ নয় এবং যাদের আয় সীমিত তারা তো জীবনভরই বিরহ ভোগ করে।
–তুমি যে মাঝে মাঝেই চুপ হয়ে যাও। আমরা আসায় কী খুব চিন্তায় পড়লা? আমারে একটা কাজ যোগাড় কইরা দেও। তোমার উপর বোঝা কমবো।
সম্বিত ফিরে পায় জয়দেব। মৃদু হাসে সে। যে হাসি কোনো অর্থ বহন করে না। স্ত্রী-সন্তান আনাই তো শেষ কথা নয়। কেবল মাত্র শুরু।
–কী কাজ করবা তুমি? আমার সাথে গাড়ি চালাইবা? জয়দেব বলে।

–ওমা, মাইয়া লোকে গাড়ি চালায় কেমনে? আর কী কোনো কাজ নাই? হুনছি, আমেরিকা মাইয়া লোকেও অনেক কাজ করে। আমি তো রান্না-বান্নার কাজ, ঘর-গৃহস্থালির কাজ ছাড়া আর কিছু জানি না।

এবার শব্দ করে হাসল জয়দেব। মুখ থেকে তার ভাত ছিটকে বের হলো। দেখতে দেখতে দুপুর গড়িয়ে গেছে। জয়দেব বিছানায় গা এলিয়ে দিলো। পাটিগণিত, বীজগণিত কোনো গণিতের হিসাবেই সে হিসাব মেলাতে পারছে না কাজটা কী ঠিক করল নাকি কোথায়ও গরমিল আছে। এতদিন একা ছিল, ভালো ছিল। যা আয় করত তা থেকে সামান্যই তার খরচ হতো। মাসে ভালো পরিমাণ টাকা সে গচ্ছিত রাখতে পারত অথবা দেশে পাঠাতে পারত। এখন পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৫ জন। উপার্জনকারী সে একাই। সেটা খুব একটা বড় কথা নয়। বড় কথা আমেরিকার আলো-বাতাস পেয়ে পরিবারে সদস্যরা বিগড়ে না গেলেই হলো। এদেশে ব্যক্তি-স্বাধীনতার নামে বেশকিছু বেলেল্লাপনা তাকে ভাবিত করে।

কখন জানি নিদ্রাদেবী জয়দেবের চোখে নেমে এলো। এর আগে দিনে তেমন একটা শোয়া হতো না কখনই। সে রকম সময়ই তার হতো না। দিনে বারো ঘণ্টা, সপ্তাহের প্রতিদিন ট্যাক্সি চালানো শুধু কঠিন কাজ বললে বোধহয় কমই বলা হবে। কঠিন কাজগুলোর মধ্যে কঠিনতম। নিষ্ঠুরতম কঠিন।
ছেলেমেয়েদের খাইয়ে এবং নিজে খেয়ে মধুমিতা শোবার ঘরে গেল। স্বামী ঘুমাচ্ছে দেখে সে আর তাকে কোনো রকম বিরক্ত করল না। দরজা আটকিয়ে সে স্বামীর পাশে শুয়ে তার মাথায় হাত বোলাতেই জয়দেবের ঘুম ভেঙে গেল। গত ক'বছরে জাগরণে অথবা নিদ্রায় কারো হাত পড়েনি তার চুলে। জীবনটা কেটেছে এক অন্তহীন হতাশার মধ্যে। আস্তে করে চোখ মেলে জয়দেব স্ত্রীর দিকে তাকাল।
–আমি তোমার ঘুমটা ভাঙাইয়া দিলাম? নিজেকে কেমন জানি অপরাধী মনে হচ্ছে মধুমিতার।
–না, না। এমনিতে দিনের বেলা কখনো শোয়া হয় না। চোখটা একটু লেগে এসেছিল মাত্র। তুমি মাথায় হাত দিতেই মনে হলো স্বপ্ন দেখছি না তো? আচ্ছা, তোমাকে এমন পর পর লাগছে কেন মধু?
–গত ছয় বছর দেখা নাই। আমারে যে তোমার চিনতে ভুল হয় নাই সেটাই কম কথা কি? যদি অন্যজনরে স্ত্রী ভুল কইরা নিয়া আসতা?
স্ত্রীকে ঝাপটে ধরলো জয়দেব। আসলেই খাঁটি কথা। ছ' বছর। ছ' বছরে বাহাত্তর মাস। ছ' বছরে মানুষ অনেক বদলে যায়। অনেক কিছুর বদল হয়ে যায় ।
–দিনের বেলাই? স্বামীর বাহু বন্ধন থেকে মধুমিতা নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার কৃত্রিম চেষ্টা করে। কেন সে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবে? নিজের স্বামীই তো। পর পুরুষ তো আর নয়। কতগুলো বছর বেচারার একা কেটেছে। দেশে থাকলে এ ক'বছরে আরো ক'টি সন্তানের মা হতে পারতো সে। আরো একটি, দু'টি...
–আমেরিকা আবার দিন-রাত কী? এখানে দিন-রাত সমান। ওরা কোথায়?
–সবাইকে খাওয়ানোর পর বিছানায় শোয়াইয়া দিছি। এতক্ষণে সব কয়টা ঘুমাইয়া গেছে। তোমার কথা কও।
–আমার আবার কথা কি? এখন ঘুমাও। রাতে কথা হবে।
–দিনের বেলা আমার ঘুম আইবো না। তুমি বরং ঘুমাও। আমি তোমার মাথায় হাত বুলাইয়া দিই। কত বছর তোমারে আদর করতে পারি নাই।
–অসুবিধা কি? এখন করবা। যা বাকি আছে সব পরিশোধ কইরা দিবা।
স্ত্রীর কপালে হাত রাখলো জয়দেব। পরম মমতায় এবং আদরে। জয়দেবের কাছে মনে হলো মোমের মতো গলে যাচ্ছে মধুমিতা। বিরহ কী তা বিরহি ছাড়া কেউ বুঝবে না। স্ত্রী-সন্তান পৃথিবীর এপ্রান্তে-ওপ্রান্তে থাকলে জীবনটাকে কতটা ধুসর বালুময় মনে হয় জয়দেব তা গত ছ'বছর হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে।
নিজের মাথাটা মধুমিতা স্বামীর বুকের মাঝে লুকাতে চাচ্ছে। চুল থেকে তার একটি গন্ধ বের হচ্ছে। মধুমিতার চুলের গন্ধ এরকম নয়। গত ২/৩ দিন চুলের যত্ন নেওয়া সম্ভব হয়নি। খোঁপা বেঁধে রাখাতে

চুলে উটকো গন্ধ জমে গেছে। সে চুলেই আদর করছে জয়দেব। বয়সের কথা সে ভুলে গেছে। স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসার মাঝে আবার বয়স কী? বয়স গণনা হচ্ছে বার্ধক্যের লক্ষণ।

-কই, তোমার কথা তো কিছু কইলা না। মধুমিতার নিঃশ্বাসের গরম বাতাস জয়দেবের বুকে লাগছে।

-কি বলবো? যা বলার ছিল সবই তো ফোনে বলেছি। কিছু কী বাকি রেখেছি নাকি? কাছে থাকলে হয়তো এতকিছু বলতে হতো না।

-কিছুই কী কওনের নাই? সব বলা শেষ? কী শুনতে চায় মধুমিতা স্বামীর কাছে?

-তুমিই বলো না কী বলবো?

-আমি যদি বলে দিলাম তাইলে তো আমারেই আমি বলতে পারি।

-আচ্ছা ঠিক আছে। আমি তোমাকে ভালোবাসি মধুমিতা।

-এই কতাটা কইতে এত সময় লাগলো? স্বামীকে শক্ত করে ঝাপটে ধরলো মধুমিতা।

-এসব বলার এখন কী আর বয়স আছে?

-ভালোবাসাবাসির আবার বয়স কি? স্বামী স্ত্রীকে কইবো আমি তোমারে ভালোবাসি। এইখানে বয়স আবার বাধা হইবো কেন? এক বছরের জন্য নবায়ন করে নেওয়া আরকি। হো হো করে হাসলো জয়দেব। মধুমিতাও হাসলো। বাইরে সুন্দর পড়ন্ত বিকেলটাও কী তাদের সাথে হেসেছিল?

জীবন কত সুন্দর ও অর্থপুর্ণ হতে পারে সেটা এই মুহূর্তে জয়দেবের চেয়ে বেশি ভালো কেউ জানে না। সে ঠোঁটটা স্ত্রীর কপালে ঠেকাল। স্ত্রীর চুলে হাত বোলাতে আরম্ভ করল। মধুমিতা কেমন যেন একটি শিহরণ অনুভব করছে।

-কিছুটা ঘুমিয়ে নাও। বললো জয়দেব।

-ঘুম আসে না। কেমন জানি অস্থির অস্থির লাগে। জবাব দিলো মধুমিতা।

অস্থির লাগবে কেন? দেখবে হলিউডের ডাইলের পানি পেটে পড়লে সব ঠিক হয়ে যাবে। কোথা থেকে কোথা এসেছো তাই হয়তো এমন লাগে।

-ডাইলের পানি, ডাইলের পানি একদমই করবা নাতো। দেশে ডাইলের কেজি কত জানো? ডাইল আর এখন গরিবের খাদ্য নাই। আর ডাইলের পানি খাওনোর লাইগ্যা আমেরিকা আইছি নাকি? দেশেই তো ডাইলের পানি খাইতে পারতাম।

-তাহলে কী খাবে? আমারে খাবে?

-তোমারে যেভাবে খাওনের সেভাবে খামু। গত ছয় বছর তো ঠক দিয়া আইছো। যামু, যামু কইরা তো আর যাইতে পারলা না। আমরাই শেষে আইসা পড়লাম। আর ঠকাইতে পারবা?

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল জয়দেব। আসলেই ছ'ছটা বছর। তোমাদেরকে আনার ঝামেলাই আমার আর দেশে যাওয়া হলো না। এবার দেখি যাওয়া যায় কিনা।

কিছুক্ষণ নীরবতা। কখন যে মধুমিতা ঘুমিয়ে গেল টের পেল না জয়দেব। খানিকক্ষণ চোখ বন্ধ করে রাখলো সে। তার ঘুম আসছে না। কেমন যেন অস্থিরতা, উত্তেজনা উত্তেজনা লাগছে। স্ত্রীর বাহুবন্ধন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিলো জয়দেব। এ-ঘরে ও-ঘরে পায়চারী করছে সে। নিজের স্ত্রী, সন্তান গত ছ'বছর যাদের সে মুখ দেখেনি। তারাও তাকে দেখেনি।

জয়দেব এঘর ওঘর পায়চারী করছে আর স্ত্রী ও সন্তানদের ঘুমানো দেখছে। কী নিশ্চিন্ত মনে তারা ঘুমাচ্ছে। কোনো টেনশন নেই। স্ত্রী চলে এসেছে তার স্বামীর কাছে। সন্তানেরা চলে এসেছে তাদের পিতার কাছে। কী শান্তি। পরম প্রশান্তি। এঘর ওঘর সর্বত্রই শান্তি। গত ক'দিন যে ঘরটা ছিল শুন্য, আজ সেখানে শুন্যতা নেই, পুর্ণতায় পরিপুর্ণ। এঘরে স্ত্রী ওঘরে তিন সন্তান এক খাটে পাশাপাশি, গলাগলি, জড়াজড়ি করে ঘুমাচ্ছে। এঘরে শান্তি, ওঘরে শান্তি। শান্তির পস্নাবন। কোথাও ছিল এতদিন এ শান্তিগুলো? শান্তিনগর,শান্তিপুর, শান্তিবাগ, শান্তি নিকেতন বা অন্য কোথায়? মনে পড়েছে জয়দেবের। এতদিন শান্তিগুলো হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগের কম্পিউটারে আবদ্ধ ছিল। শুধু একের পর এক কাগজ এবং অযৌক্তিক লম্বা তারিখ। অযথা সময় ক্ষেপন আর সে সাথে নীরবে রক্তক্ষরণ।

একঘণ্টা পর চোখ মেলল মধুমিতা। হতচকিয়ে গেল সে। কোথায় এলো, কী করে ঘুমালো ঠিক মনে করতে পারছে না। উঠে বসল সে।
জয়দেব এসে তার পাশে বসলো। হাত ধরলো স্ত্রীর।
–ভয় পেয়েছো? স্বপ্ন দেখছিলে কিছু?
–না মানে, না মানে... হঠাৎ মনে হলো আমি এখানে কেন? তুমি না আমার পাশে ছিলে?
–ছিলাম। ঘুম আসছিলো না, তাই উঠে গেলাম। তোমরা ঘুমাচ্ছ সেটা ঘুরে-ফিরে দেখছিলাম।
–ঘুমন্ত লোককে দেখার কী আছে। ঘুম আর মরা তো সমান। হঠাৎই মধুমিতার মনে হলো সে ঘুমালে তাকে দেখতে কেমন লাগে সেটা সে স্বামীর কাছে জানতে চাইবে। ঘুমালেও তো মানুষের একটা রূপ থাকে। যেহেতু সে এতক্ষণ তার ঘুমানো দেখেছে।
–ঘুমালে আমাকে দেখতে কেমন লাগে? কৌতূহল নিয়ে মধুমিতা স্বামীকে জিজ্ঞেস করলো।
কঠিন প্রশ্ন, আজব প্রশ্নও বটে। স্ত্রী ঘুমিয়েছে, সে ঘুরে-ফিরে দেখেছে। কীভাবে সে ঘুমিয়ে এটা ব্যাখ্যা করা তো মুশকিল।
–বল না ঘুমালে আমাকে কেমন লাগে? অনেকটা ন্যাকামো করে বললো মধুমিতা।
-ঘুমকন্যার মতো লাগে। মনে হয় এ কথায় মধুমিতা খুব খুশি হয়েছে । ঘুমকন্যা কোনো বিশেষ খ্যাতিমান রমণী হতে পারে। যা স্বামীর জানা আছে, তার নেই। প্রায় শূন্য ওজনে সে নিজেকে জয়দেবের উপর ছেড়ে দিলো।
–যাও, হাত মুখ ধুয়ে এসো। ওদের ঘুম ভাঙলে চলো বাইরে থেকে ঘুরে আসি।
মাথা কাত করে সম্মতি জানালো মধুমিতা। মনোযোগ দিয়ে জয়দেব তা দেখলো। ছ'বছর আগে দেশে রেখে আসা স্ত্রীকে আজ তার কাছে মোমের পুতুল বলেই মনে হচ্ছে।
মধুমিতা বাথরুমে গেলে জয়দেব ছেলেমেয়েদের একজন একজন করে কপালে হাত রাখলো। তারা পিটপিট করে চোখ মেলে পিতার দিকে অপলক তাকাচ্ছে যেন কোনো অচেনা লোককে দেখছে।
মেয়েটাকে কোলে নিল জয়দেব। যদিও তার কোলে চড়ার বয়স পার হয়ে গেছে। গেলে যাক। ছেলে-মেয়েরা কত বছর বয়স পর্যন্ত বাবার কোলে চড়তে পারবে তার কোনো বিধিবিধান কোথাও নেই। প্রিয়ন্তি বাবার কোলে চড়ে মনে হয় খুব আনন্দ পেলো। জয়ন্ত ও পড়ন্ত ড্যাব ড্যাব করে বাবা ও বোনের দিকে চেয়ে আছে। বাধ্য হয়ে জয়দেব মেয়েকে কোল থেকে নামালো এবং ছেলেদের একজন একজন করে নিয়ে আদর করে আবার খাটে বসালো। মধুমিতা বাথরুমে থেকে বের হয়ে এলো।
–তোমরা সবাই হাত-মুখ ধুয়ে এসো, আমি তোমাদের জন্য চা বানাই। জয়দেব সকলের উদ্দেশ্যে বললো।
–তুমি চা বানাতে পার বাবা? প্রিয়ন্তি বাবাকে বলল। সে এসে বাবার কাছে রান্নাঘরে দাঁড়াল।
–চা বানানো এমন কী কাজ? দেখলে না তোমাদের জন্য রান্না করে রেখেছিলাম? যাও, হাত মুখ ধুয়ে এসো। চা খেয়ে আমরা বাইরে যাবো। বাইরে থেকে হেঁটে আসলে ভালো লাগবে। জয়দেব চুলায় জল বসিয়ে দিলো।
–এ কী চুলা ধরাইতে ম্যাচ বাতি লাগলো না? অবাক হয়ে মধুমিতা স্বামীকে জিজ্ঞেস করলো। আস্তে আস্তে সে স্বামীর কাছে গেল।
–এখানে চুলা ধরাতে দেয়াশলাই লাগে না। জবাব দিলো জয়দেব।
–আজব দেশ তো। বলেই মধুমিতা বাকি চুলাগুলো জ্বালিয়ে দেখলো। সত্যিই তো, চুলা জ্বালাতে দেয়াশলাইয়ের দরকার হয় না। খুশি হলো মধুমিতা । এ না হলে আমেরিকা? গ্যাস ছাড়া যদি চুলা জ্বলতো তাহলেও অবাক হবার কিছু ছিল না।
পড়ন্ত বিকেল। সোনাঝরা বিকেলই বলা যায়। ছেলেমেয়েরা অবাক হয়ে চারদিকে তাকাচ্ছে। তাদের যেন বিশ্বাস হচ্ছে না তারা আমেরিকা চলে এসেছে।
–একটা রিকশাও তো দেখলাম না। এই শহরে রিকশা নাই? মধুমিতা প্রশ্ন করল স্বামীকে।
–না রিকশা নেই। ঢাকা শহর মনে করলে নাকি এটাকে?
–না, তা মনে করি নাই। আমেরিকা যে আইসা গেছি তা বুঝতে পারছি। কী সোন্দর শহর। একটা রিক্‌শা নাই, কালা ধোঁয়া নাই, গাড়ির শব্দ নাই। পিঁপড়ার মতো লাইন দিয়া কী সোন্দর কইরা চলে।

আর বাংলাদেশে? মানুষের মাথা মানুষে খায়। ঢাকা শহর তো এখন একটা নরকের শহরের মতো। কয়েক দিনে আমার দম বন্ধ হওনের যোগাড় হইছিল।
ছেলেমেয়েরা আগে আগে হাঁটছে আর জয়দেব ও মধুমিতা পিছনে। সামনেই একজন স্প্যানিশ পুরুষ ও মহিলা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চুমো খাচ্ছে। তা দেখে থমকে দাঁড়ায় মধুমিতা।
–দেখ, দেখ ওদের কী লজ্জা শরম কিছু নাই? দিনের বেলা...? মানুষের সামনে? ছি ছি। ঘরে কী জায়গা নাই নাকি? মধুমিতা যেন আর হাঁটতে চায় না।
–চল তো, আরো কত কী দেখবে। এটা তো কিছুই না। স্ত্রীর হাত ধরে টান দিলো জয়দেব।
–এমন দৃশ্য দেখলে তাকাবে না। তাহলে ভাববে তুমি একটা ক্ষেত। জয়দেব স্ত্রীর হাত ধরে হাঁটতে আরম্ভ করল।
–আমি তো একটা ক্ষেতই। বাংলাদেশি ক্ষেত। দেখ, এখনো গায়ে বাংলাদেশের গন্ধ। দেখ, দেখ। বলেই মধুমিতা তার ডান হাতটা স্বামীর নাকের সাথে ঘষা দিলো।
স্ত্রীর হাতটা খপ করে ধরল জয়দেব।
–ছাড়ো, ছাড়ো বলে মধুমিতা স্বামীর হাত থেকে নিজের হাত ছাড়ানোর চেষ্টা করল। তবে বেশি জোর খাটাল না সে। স্বামীই তো ধরেছে। আর তো কেউ নয় কিন্তু দিনের বেলা, সামনে ছেলেমেয়েরা রয়েছে। লোকে দেখলে বলবে কী। লজ্জা-শরম বলতে একটা জিনিস আছে না?
তারা পরস্পর কাছাকাছি হয়ে হাঁটছে। স্প্যানিশ বা আমেরিকান স্টাইলে নয়, বাঙালি স্টাইলে।
–ঐ বাসায় নির্মলদা থাকে। যার কাছে তোমাদের জন্য জিনিসপত্র পাঠিয়েছিলাম। এক্ষুণি দেখা হয়ে যেতে পারে। এখন তার কাজে যাবার সময়। জয়দেব বলল।
–ওমা, এমন আজব কথা তো শুনি নাই কখনো। এখন তো প্রায় সন্ধ্যা। এখন লোক বাড়িতে ফিরবে আর উনি কিনা কাজে যাবে? নিজের মুখের কাছে আঙ্গুল নিলো মধুমিতা। সব দেখি উল্টা পাল্টা কারবার। লাইটের সুইচ উল্টা দিকে, গাড়ি চলে উল্টা দিকে, মানুষগুলিও বোধহয় উল্টা দিকেই চলে।
–তুমিও দু'দিন বাদেই উল্টা দিকে চলবা। স্ত্রীর হাতটা আরো শক্ত করে ধরল জয়দেব।
–এবার ঝটকা মেরে মধুমিতা স্বামীর হাত থেকে নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নিলো । খেদোক্তির সাথে বলল–মধুমিতা সে রকম মাইয়াই না। এত বছর যে দেশে একলা রাখলা কোনো কথা শুনছো? কও, শুনছো কোনো কথা? মধুমিতা সামান্য উত্তেজিত।
–কত কথাই তো শুনেছি।
–কী শুনেছো? বল, কী শুনেছো? সামান্য কাঁপছে মধুমিতা।
জয়দেব ভাবলো এখনই স্ত্রীকে রাগিয়ে তোলার দরকার নেই। সময় তো আছে। এলো তো মাত্র কয়েক ঘণ্টা।
স্বামীকে মৃদু ধাক্কা দিলো মধুমিতা–কও না কী শুনছো?
–শুনেছি তুমি সারাদিন আমার ধ্যানে দিন কাটাতে। সারাক্ষণ ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করতে কবে আমার কাছে আসবে।
–দিলা তো আমার রাগডারে মাডি কইরা? মধুমিতার তেজস্বী ভাবটা আর নেই।
–তুমি কী ঝগড়া করার জন্য আমেরিকা এসেছো?
–ঝগড়া করমুম, ফাইট করমুম, আরো কত কী করমুম? একলা ছয় বছর ফালাইয়া রাখনের মজাটা লইমু না? এমনিতেই ছাইড়া দিমু ভাবছো?
নির্মল বাবু বাসা থেকে বের হয়ে সামনের ফুটপাতে জয়দেবকে পরিবারসহ দেখতে পেল। তারা যে আজ আসবে নির্মল সেটা জানত কিন্তু এখনই দেখা হয়ে যাবে সেটা ভাবেনি।
–এ আমি কাদেরকে দেখছি? অ্যাঁ। মেঘ না চাইতেই বৃষ্টি। নমস্কার বৌদি। কেমন আছ তোমরা? বলেই নির্মল প্রিয়ন্তি, জয়ন্ত, পড়ন্তের মাথায় হাত বুলিয়ে দিলো।
মধুমিতা মাথায় ঘোমটা দিয়ে নির্মলের নমস্কারের জবাব দিলো। ছেলেমেয়েরা সবাই জবাব দিলো তারা ভালো আছে।
–নির্মলদা, একটু আগে যার কথা তোমাকে বলেছিলাম। পরিচয় করাতে হবে? আমার...।

-থাক, থাক পরিচয় করানোর দরকার নেই। চিনতে আমার কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। তবে এমন সময় দেখা হলো যে বাসায় নিতে পারলাম না। কাজে যাবার সময় হলো। কথাও বলতে পারলাম না।
-ঐ নিয়ে আপনি কিছু ভাববেন না তো নির্মলদা। আমি জানি এখন আপনার কাজে যাবার সময়। যাক, দেখা হয়ে গেল, ভালো হলো।
অস্বস্তিবোধ করছে নির্মল বাবু। বাসার সামনে তাদের সাথে দেখা অথচ বাসায় নিতে পারছে না। কাজের সময় হয়ে গেছে। সে গিয়ে কাজে যোগদান করলে তবে অন্যজন যাবে। দেরি হলেই মুখ ভার করবে সে। এমনকি মালিককে ফোনও করতে পারে। জয়দেব এর সবই জানে।
-আপনি যান নির্মলদা। আপনার অস্বস্তিবোধ করার কোনো কারণ নেই। এখানকার হালচাল আমি তো জানি। মঙ্গলবার তো আপনার ছুটি। মঙ্গলবার আপনি আমাদের সাথে ডাল-ভাত খাবেন। সারাদিন আলাপ করবো।
কী বলে নির্মল বাবু বিদায় নেবে ঠিক বুঝতে পারছে না। একটা কিছু তো বলা দরকার-পথে আসতে কোনো ঝামেলা হয়নি তো বৌদি?
মাথা নেড়ে মধুমিতা না-সূচক জবাব দিলো। মুখে কোনো কথা বললো না।
-তাহলে গেলাম জয়দেবদা। গাড়ি আসার সময় হয়ে গেছ। ঘড়ির দিকে তাকালো নির্মল বাবু।
-হ্যাঁ ঠিক আছে। মনে থাকে যেন মঙ্গলবার।
-মনে থাকবে, মনে থাকবে। বৌদির হাতের প্রথম রান্না খাব মনে থাকবে না? বলেই নির্মল বাবু দ্রুত গতিতে হাঁটতে লাগল।
নির্মল বাবু চলে গেলে তারা আবার হাঁটতে আরম্ভ করল। বাসার আশে পাশে অনেক বাংলাদেশি পরিবার বাস করে। একটু দুরেই কয়েকটি বাংলাদেশি দোকান। আজ তারা সে পর্যন্ত যাবে না। বাসার আশপাশে একটু হেঁটেই বাসায় চলে যাবে।
বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে নেমে এলো। দেশে থাকলে সন্ধ্যে বেলা যেমন পূজা-অর্চনার একটা ব্যাপার থাকে এখানে তেমনটা নেই। মধুমিতা বাসায় যাবার জন্য স্বামীকে তাড়া করছে। একটু আগে সব ভালো লাগলেও এখন কেন জানি ভালো লাগছে না।
-চল বাসায় যাই। স্বামীর হাত ধরে টান দিলো মধুমিতা।
-কেন, ভালো লাগছে না? চল, আর একটু হাঁটি।
-না, আরেক দিন। এই, চল সবাই বাসায় যাই। ছেলেমেয়েদের উদ্দেশ্যে বললো মধুমিতা।
-এখন কী একা বাসায় যেতে পারবে? স্ত্রীকে প্রশ্ন করল জয়দেব।
-কেন পারবো না? তুমি কী আমাকে এতটাই বোকা মনে করছো? আমি সেকেন্ড ডিভিশনে এসএসসি পাশ করা মাইয়া। এতটা বোকা না। কিছু যে জানি না এমন বোকা ভাইবো না আমাকে।
-ঠিক আছে, ঠিক আছে। তুমি আগে হাঁটো, আমরা তোমার পিছনে হাঁটি।
কয়েক বস্নক হাঁটার পর তারা এখন আর তাদের নিজ বস্নকে নেই। নিজ বস্নক থেকে তারা তিন বস্নক দুরে আছে। কথায় কথায় মধুমিতা সেটা খেয়াল করতে পারেনি। কয়েকটি বাড়ির পর এক বাড়ির সামনে গিয়ে মধুমিতা স্বামীকে তার ক্যারিশমা দেখালো-এই তো বাসা। বলেই সে চাবি ছাড়া গেট নিয়ে নাড়াচাড়া শুরু করলো।
-এই তোমার সেকেন্ড ডিভিশনে এসএসসি পাশ করার বিদ্যা? প্রিয়ন্তি এটা কী আমাদের বাসা? জয়ন্ত, পড়ন্ত...।
তারা তিনজনেই জবাব দিলো-এটা তাদের বাসা নয়। তবে হ্যাঁ, দু বস্নক পরে ঠিক এমন অবস্থানেই বাসা।
-প্রথমবারেই হাইরা গেলাম? আস্তে আস্তে একা একা বলছে মধুমিতা । সে কথা শুনতে জয়দেবের কোনো কষ্ট হয়নি।
-নকল করে পাশ করোনি তো? স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে বললো জয়দেব।
-সেই পাশ ফেলের সাথে তো আমেরিকায় বাসা খোঁজনের কোনো সম্পর্ক নাই, আছে? একটা না হয় ভুল করলাম তাই বইলস্না নকলের কথা আইলো কেমন? কোন ব্যাটা নকল না করে? একটু যেন বিব্রত মধুমিতা।

–থাক সে সব কথা। এখানে থেকে দু বস্নক পরে ঠিক এই বরাবরই আমাদের বাসা। একটু মস্করা তো তোমার সাথে করতে পারি, কী পারি না?

–তাতো পারোই। মস্করা কেন, আরো অনেক কিছু করতে পারো। আমি তোমার স্ত্রী না? স্ত্রীকে স্বামীরা অনেক কিছু করতে পারে। যেমন তোমারে আমি... অনেক কিছু করতে পারি।

সন্ধ্যে উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। লাইটপোস্টে লাইটগুলো অনেক আগ থেকেই জ্বলতে শুরম্ন করেছে। মিষ্টি মিষ্টি হাওয়া বইছে। গরমও নয়, শীতও নয়। বসন্ত কালের মতো মনে হচ্ছে সন্ধ্যেটাকে।

–এই তোরা একটু আগে আগে হাঁট। আমি তোর বাবার সাথে একটু কথা বলি। শাসনের সুরে মধুমিতা ছেলেমেয়েদের বলল।

–তোমাকে মানা করেছে কে? প্রিয়ন্তি ঝাঁঝালো সুরে জবাব দিলো।

–তুমি আমাকে কী কী করতে পারো? জয়দেব প্রশ্ন করলো স্ত্রীকে।

–এই ধরো, তোমার গা টিপে দিতে পারি, ঘুম না আসলে মাথায় জল-তেল মিশাইয়া দিতে পারি। তোমার জামাকাপড় ইস্ত্রি করে রাখতে পারি, তোমার টাকা-পয়সার হিসাব রাখতে পারি। স্ত্রীরা স্বামীর জন্য যা যা পারে আর কি।

স্বামীর কাছে এসে একটা আঙ্গুল নিজের হাতের মুঠে নিয়ে মধুমিতা আবার বলতে আরম্ভ করল–দেশে থাকতে আমি যে সারাদিন তোমার ধ্যান করতাম এই কথা তোমারে কে কইছে?

এ কথার কোনো জবাব না দিয়ে জয়দেব স্ত্রীর হাতের দিকে তাকালো। নিজের একটি আঙুল স্ত্রীর হাতের মুঠোয়।

–হাত ধরলে যে? লোকজন যদি দেখে? স্ত্রীর হাতের দিকে তাকিয়ে বললো জয়দেব।

–আন্ধার হইয়া গেছে না? এখন আর কে দেখবো? জবাব দিলো মধুমিতা

–লাইটেরও চোখ আছে । লাইটগুলি যদি দেখে তুমি আমার হাত ধরেছো? মধুমিতা মনে হয় সত্যি সত্যি বিশ্বাস করেছে লাইটপোস্টের লাইটগুলোর চোখ আছে। সে স্বামীর আঙ্গুল ছেড়ে দিলো। ঘাড় কাৎ করে লাইটের দিকে তাকাল।

–কই, লাইটের চোখ কই? বোকা বানাইলা আমারে? বানাও, আইছি যখন তোমার আমেরিকা। যেই কয়দিন পারো বানাও।

–একটু আগে না বললা আমি তোমার সাথে মস্করা করতে পারি?

–ও, তাইলে লাইটের চোখ নাই? আমি তো ভাবলাম সত্যি সত্যি থাকতে পারে। আমেরিকা বইলা কথা। এখানে লাইটের চোখ থাকনটা অসম্ভব কিছু না।

এবার আঙ্গুল না, স্বামীর একটা হাত মধুমিতা নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে নিলো।

–আবার ধরলা? জয়দেবের ভাবটা এমন যে স্ত্রী, তার হাত ধরার কোনো অধিকার রাখে না। ছেলেমেয়েরা সামনে সামনে হাঁটছে। তারা এদের কথা শুনতে পাচ্ছে না।

–ধরবো না? নিজের স্বামীর হাত ধরবো না? ছয় বছরে কয়বার ধরতাম?

–তুমি দেখি ছ'ছরের কথা ভুলতেই পারছো না। এখন তো এসেই গেছ।

–তুমি কী বুঝবা? মাইয়া মানুষ হইলে বুঝতা। সাধে কী আর স্ত্রীরা পর পুরম্নষ লইয়া লটরপটর করে?

লম্বা একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলো জয়দেব। অতীত হয়ে যাওয়া সময়গুলোকে ফিরিয়ে আনা জয়দেবের সাধ্যের বাইরে।

বাসার সামনে চলে এলো তারা।

–এটাই তো আমাদের বাসা তাই না বাবা? জয়ন্ত বলল।

পড়ন্ত জবাব দিলো এটাই তো থ্রি ফোর জিরো।

জয়দেব পকেট থেকে চাবি বের করে জয়ন্তের হাতে দিলো। দেখ তো খুলতে পারো কিনা।

তিন ভাইবোনে চেষ্টা করে গেটের তালা খুললো।

–আমরা যদি অন্য বাসায় ঢুকে পড়তাম তাইলে কী হইতো? মধুমিতা স্বামীকে প্রশ্ন করলো।

–কী হতো? সে বাসার লোক তোমাকে তাঁর গার্লফেন্ড মনে করে রেখে দিত। আশ্চর্যান্বিত হলো মধুমিতা। এটাই কী আমেরিকার নিয়ম? স্বামীকে প্রশ্ন করলো মধুমিতা।

–হ্যাঁ এটাই নিয়ম। তাচ্ছিল্যের সাথে জবাব দিলো জয়দেব।

–তোমরা সবাই টিভি দেখ, আমি রান্না করি। খেয়েদেয়ে সকাল সকাল ঘুমিয়ে পড়। তোমাদের ঘুম দরকার।
–আমি থাকতে তুমি রান্না করবা? মধুমিতা বলল।
–একদিনেই তো সব পারবে না। আগে শিখতে হবে তো।
–বারবার বোকা বানাইবা না তো। গ্রামের মাইয়া আমি। আমার আবার রান্না করতে ডিগ্রি লাগবে নাকি? কোথায় কী আছে। তুমি আমারে দেখাইয়া দেও। দেখ, মধুমিতা পারে কিনা।
–আচ্ছা, আচ্ছা ঠিক আছে চল। প্রথম দিন দু'জনেই করি।
খাওয়া-দাওয়া শেষ ছেলেমেয়েদের ড্রয়িংরুমে এবং নিজেরা বেডরুমে শুয়ে পড়লো।
লাইট অফ করে দিলো জয়দেব। বাইরে থেকে কিছুটা আলো ঘরে আসে।
–কইলা না আমারে ছাড়া তোমার এতগুলা বছর কেমনে কাটলো? স্বামীর গলা ধরে প্রশ্ন করলো মধুমিতা।
–তোমার যেমনি কেটেছে, আমারও তেমনি কেটেছে। এখন কী ঘুমাবে নাকি আরো কিছু করতে হবে?
–তোমার বউ, তুমি জানো তুমি কী করবা। আমি কী জানি? স্বামীকে আরো শক্ত করে ধরলো মধুমিতা।
দু'জন একাকার হয়ে গেল। আমেরিকাকে এখন আর মধুমিতার কাছে দূরের কোনো দেশ বলে মনে হচ্ছে না। আর বাংলাদেশ তো জয়দেবের কাছে কখনো কোনো দূরের দেশ নয়।

২.

কয়েকদিন বিশ্রামের পর জয়দেব স্ত্রী ও সন্তানদের ইংলিশ শেখার জন্য স্কুলে ভর্তি করে দেয়। ছেলেমেয়েদের রেগুলার স্কুলে ভর্তি করতে হলে তাদের ইংরেজি জানা দরকার। আর এদেশে থাকতে হলে ন্যূনতম ইংরেজি না জানলে টিকে থাকা দায়।
প্রিয়ন্তির বয়স বারো। জয়ন্ত দশ এবং পড়ন্ত আট। ছেলেমেয়েদের পাবলিক স্কুলে ভর্তি করাতে কয়েক মাস অপেক্ষা করতে হবে। সে সময়টা তারা যদি ইংরেজি খানিকটা শিখে নিতে পারে তবে ভালোই হয়। মা-ছেলে-মেয়েরা একই স্কুলে যায়। তারা মনোযোগ দিয়ে ইংরেজি শিখছে।
তৃতীয় বিশ্ব থেকে উঠে আসা একটি পরিবার প্রথম বিশ্বে তথা বিশ্ব বিনোদন নগরী লস এঞ্জেলেসে তাদের বসতি স্থাপন করেছে। ভাবতে খারাপ লাগে না জয়দেবের। নিজের জীবন যেভাবে গেছে, যাক। ছেলেমেয়েরা যদি এদেশে পড়ালেখা করে প্রকৃত মানুষ হতে পারে তাহলেই সব পরিশ্রম সার্থক হবে। স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে জয়দেব। এতদিনের শূন্যতা এখন যেন কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে গেছে।
স্ত্রী, ছেলেমেয়েরা আনন্দ-স্ফূর্তি করতে করতে একসাথে স্কুলে যায়। জয়দেব মনোযোগ দিয়ে তাদের দেখে। নিজেকে সুখী সুখী মানুষ মনে হয়। তাদের জন্য ভালো ভালো খাবার কিনে সে। স্বপ্নগুলোকে কেমন যেন বন্ধু বন্ধু মনে হয়। মধুমিতা একটু ইংরেজি শিখে কোনোরকম একটা কাজ পেলে তাকে এতটা পরিশ্রম না করলেও চলবে। ছেলে দুটো পড়ালেখা করে চাকরি করবে। মেয়েটাকে বিয়ে দিয়ে দিবে। ছেলেমেয়েরা বড় হলে সবাইকে একটা করে গাড়ি কিনে দেবে জয়দেব। সম্ভব হলে ছোট একটা বাড়ি কিনবে। সে বাড়িতে সোনালি সুখের চাষ হবে। হলুদ রংয়ের, নীল রংয়ের, বেগুনি রংয়ের সুখ ধরবে সুখের গাছে। সুখের শাদা পায়রা উড়বে বাড়ির পাশ দিয়ে। আষাঢ়ে মেঘগুলো নিচু হয়ে তার বাড়ির ছাদ ছুঁই ছুঁই হয়ে উড়ে যাবে। যে দিকে সে তাকাবে সেদিকেই দেখবে সুখ আর সুখ। জীবন যে কেবল বিরহেই পূর্ণ নয় তা সে অনুভব করবে। জীবনে বিরহ আছে, আবার সুখও আছে। এখন তার সুখের দিন। সুখের ভেলায় ভেসে বেড়াবে সে। যার এমন সতী সাধ্বী, স্বামী ভক্তি পরায়ণা স্ত্রী থাকে তার কপালে সুখ না থেকে পারে না। সুখ এমন কোনো দুর্লভ বস্তু নয় যে তাকে ধরা যাবে না, ছোঁয়া যাবে না। উপভোগ করা যাবে না।
স্বপ্নগুলোকে কেমন যেন চেনা-চেনা মনে হয় জয়দেবের কাছে। মনে হয় এর আগেও এর সাথে তার পরিচয় ছিল, সম্পূর্ণ চেনা জিনিসকে নতুন করে চিনতে তার আর অসুবিধা হবার কথা নয়।

 কয়েকদিন পার হয়ে গেছে। আস্তে আস্তে জয়দেব সব গুছিয়ে নিয়েছে। এখন তাকে আগের চেয়ে বেশি পরিশ্রম করতে হচ্ছে কারণ খরচ আগের তুলনায় বহুগুণ বেড়ে গেছে। তবুও সে সুখী, এ কারণে যে দীর্ঘদিন ঝুলে থাকা একটা বিষয়ের সুরাহা হয়েছে। দীর্ঘশ্বাস এখন আর আসে না।

সকালবেলা কাজে যাবার আগে জয়দেব সবাইকে নিয়ে সকালের নাস্তা খেতে বসলো। আজ স্ত্রী, ছেলেমেয়েদের স্কুল বন্ধ। এতদিন রাতে ছাড়া সবার এক সাথে খাওয়া হয়নি।

–তারপর বল প্রিয়ন্তি, আমেরিকা তোমার কেমন লাগছে? পড়ালেখা করতে কোনো অসুবিধা হয় কিনা? জয়দেব বললো মেয়েকে।

–ভালো, ভালো লাগছে বাবা। আমেরিকা ভালো না লেগে কোনো উপায় আছে?

–গুড। জয়ন্তের খবর কী? থাকতে পারবে তো আমেরিকা? জয়দেব প্রশ্ন করলো। মধুমিতা রান্না ঘরে সবার জন্য চা বানাচ্ছে।

–পড়ন্তের খবর কী? আমেরিকা কেমন লাগছে বাবা?

–ভালো। একটাও রিকশা নাই। দেশে তো রিকশায় করে স্কুলে যেতাম। পড়ন্তের কথা শুনে সবাই হেসে দিলো। মধুমিতা চা নিয়ে খাবারের টেবিলে এলো। ছেলেমেয়েরা তাদের চায়ের কাপ নিয়ে শোবার ঘরে চলে গেলো।

–তারপর মিসেস মধুমিতা, তোমার কেমন লাগছে সবকিছু? স্কুলে কোনো অসুবিধা হয় না তো? চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বললো জয়দেব।

–এভরিথিং ইজ গুড। নো প্রবলেম। আত্মবিশ্বাসের সাথে জবাব দিলো মধুমিতা।

চায়ের কাপ টেবিলে রেখে মাথা তুলে জয়দেব স্ত্রীর দিকে তাকাল। এই বোধহয় প্রথম সে স্ত্রীর মুখে ইংরেজি শুনলো।

–আর ইউ সারপ্রাইজড? বললো মধুমিতা।

–এবার আরো অবাক হয়ে জয়দেব স্ত্রীর মুখের দিকে তাকাল। বিশুদ্ধ ইংরেজি।

–অমন করে তাকাচ্ছ কেন? ইংরেজি শেখার জন্যই তো স্কুলে পাঠিয়েছ, নাকি? টিচার বলেছে প্রথমে ঘরের লোকদের সাথে ইংরেজি বলতে শুরু করতে হবে। তাহলে তাড়াতাড়ি বলতে পারবো। তুমি তো ঘরের লোকই, নাকি বাইরের লোক? মৃদু হাসলো মধুমিতা।

এবারও জয়দেব কোনো কথা বললো না। এবার অনেকটা প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে সে স্ত্রীর দিকে তাকালো। কে জানে কী হচ্ছে, যে অবলা শুদ্ধ করে বাংলা বলতে চায় না সে ইংরেজি শিখে কোন অঘটন ঘটায় কে জানে। কোনো কথা না বলেই জয়দেব চা পান করে যাচ্ছে। টেবিলের নিচে পায়ের উপর পা রেখে পা নাড়াচ্ছে সে এবং এক পা মধুমিতার শরীরে লাগছে। স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে মধুমিতা চা পান করছে।

টেবিলটা এবার নাড়া দিলো মধুমিতা। স্বামীর মুখে কোনো কথা না শুনে সে হতাশ। কোনো কথার জবাব না দিয়ে সে চা পান করেই যাচ্ছে।

–আমার একটা কথাও কী তোমার কানে যায়নি?

এবার চমকে উঠল জয়দেব। গেঁয়ো ভুতটা এবার শুদ্ধ বাংলা বলতে শুরু করেছে। এ ক'দিনেই এত পরিবর্তন?

–অমন হাবলার মতো আমার দিকে তাকিয়ে আছ কেন? কথা বলতে কী ভুলে গেছো নাকি?

–কী বলবো সেটাই তো বুঝতে পারছিনা। এ ক'দিনেই এত পরিবর্তন? হলিউডের ডাইলের পানি পেটে পড়েছে তাহলে?

–তোমার ঐ হলিউডের ডাইলের পানির কথা শুনলেই আমার জানি কেন গা জ্বালা করে। দুলাইন ইংরেজি বললাম তাতেই তোমার মুখে রা-শব্দ নেই। ইংরেজি শেখার জন্যই তো স্কুলে পাঠিয়েছ, নাকি? তো, প্র্যাকটিস না করলে শিখবো কেমন করে?

চমক কাটে জয়দেবের। নড়েচড়ে বসে সে। আবার স্ত্রীর মুখের দিকে তাকায় সে।

–আমার উন্নতি হোক এটা কী তুমি চাও না?

–চাইবো না কেন? অবশ্যই চাই। না চাইলে কী স্কুলে পাঠাতাম? ইংরেজি না হয় স্কুলে শিখছো, শুদ্ধ করে বাংলা শিখলে কোথায়?

–ওমা, আমি কী শুদ্ধ বাংলা জানি না নাকি? এতদিন গ্রামে ছিলাম বলে সবার সাথে আঞ্চলিক ভাষায় বলেছি। এখন আমেরিকা এসেছি, এখনো সে রকম করে কথা বললে সবাই ক্ষেত বলবে না?
–তুমি তো নিজেই বলো তুমি একটা ক্ষেত।
–তাই বলে সারা জীবন ক্ষেত থাকবো? আমেরিকা এসেও পরিবর্তন হবো না? তুমি কী আমার পরিবর্তন চাও না? এভরি বডিস ওয়ান্ট এ চেঞ্জ।
–কী জবাব দেবো ঠিক বুঝতে পারছি না। খাল কেটে কুমির আনছি কিনা কে জানে?
–তোমার ঐ সন্দেহ রোগটা কিন্তু গেল না। আমাকে ঘোমটা খুলতে কিন্তু প্রথম তুমি বলেছো। যাক, কথা যখন উঠলো–কাপড় পরে স্কুলে যাই সবাই হাসাহাসি করে। বলে এশিয়ান গাই। আমি আর কাপড় পরে স্কুলে যাব না। সেলোয়ার কামিজ পরতে চাই।
–এশিয়ান গাইকে এশিয়ান গাই বললে অসুবিধা কী? তুমি তো ইউরোপ থেকে আসোনি, সেলোয়ার কামিজ পাবে কোথায়?
–সে আমি সাথে করে নিয়েই এসেছি। আমি জানতাম এগুলো লাগতে পারে।
–বা বা চমৎকার। একেবারে প্রস্তুতি নিয়ই দেখি এসেছো। তুমি মনে হয় আমেরিকায় উন্নতি করতে পারবে। তোমার পরিবর্তন বেশ দ্রুত হচ্ছে। সুপারসনিক গতিতে অনেকটা। ব্যাঙ্গ করে বললো জয়দেব।
–সে কথা আমার টিচারও আমাকে বলেছে। আমি খুব সুন্দরী, আমি খুব দ্রুত উন্নত লাভ করতে পারবো। আমার ব্রেন খুব শার্প।
–আর কী বলেছে টিচার? কোনো রেস্টুরেন্টে যেতে বলেনি?
–আসলে তোমার মনটা অনেক ছোট। টিচার নিয়েও তামাশা করতে পারো। তোমার মধ্যে একটি সন্দেহবাতিক আছে। মুখে ভেংচি কেটে মধুমিতা টেবিল ছেড়ে উঠে গেল।
–এ ক'দিনেই এত পরিবর্তন? আর তো দিন পড়েই রয়েছে। ক'দিন পরে না জানি আমাকে বিক্রিই করে দেয়।
ছেলেমেয়েরা শোবার ঘর থেকে এসে খালি কাপ টেবিলে রেখে আবার চলে গেল। বেসিনের কাছে মধুমিতা একা একা গজর গজর করছে।
–থামলে কেন, বল। বলে যাও। আর কী কী করতে চাও বলে যাও। স্ত্রীকে একটু ক্ষেপিয়ে তুলতে চায় জয়দেব।
–তোমাকে আর কোনো কথা বলবো না। যা করার আমি একাই করবো। এটা আমেরিকা। বাক স্বাধীনতার দেশ। এখানে এত অনুমতির দরকার নেই।
–তাহলে এদ্দুর? ডাইলের পানি পড়ে গেছে পেটে? সামনের দিকে মাথা নাড়লো জয়দেব।
–নিকুচি করি তোমার ডাইলের পানি। ডাইল যদি আর আনো বাসায়। ডাইলের পানি খাওয়ার জন্য আমেরিকা এসেছি? গা জ্বালা করছে মধুমিতার।
প্রিয়ন্তি এসে বাবার গা ঘেঁষে দাঁড়ালো–সবাইকে একদিন ইউনিভার্সেল স্টুডিও নিয়ে যাবে বাবা?
মাথা তুলে মেয়ের মুখের দিকে তাকালো জয়দেব। বারো বছরের মেয়ে। ছ'বছরই যার মুখ দেখেনি সে।
–বলো, নিয়ে যাবে কিনা? বাবার গলা ধরে ঝাঁকুনি দিলো প্রিয়ন্তি।
জয়ন্ত ও পড়ন্ত এসেও বোনের সাথে যোগ দিলো। এতক্ষণ বোধহয় তারা তিনজনে এ আলোচনাই করেছিল। চায়ের কাপ ধুতে ধুতে মধুমিতা একা একা কী বলছে তা সে-ই জানে।
অবশেষে জয়দেব রাজি হলো সবাইকে নিয়ে একদিন ইউনিভার্সেল স্টুডিওতে যাবে। যদিও তার এক সপ্তাহের রোজগার চলে যাবে একদিনেই। তবুও কী করা। এদের জন্যই তো এখন সব। এরা খুশি থাকলেই জয়দেব খুশি। এদের মুখে হাসি থাকলেই জয়দেবের মুখে হাসি । স্ত্রীকে নিয়ে সে সামান্য চিন্তিত। মধুমিতা দ্রুত বদলে যাচ্ছে, আবার ভাবে সে। বদলে আর যাবে কোথা? কতটুকুই বা তার জীবনের দৌড়? কয়েক লাইন ইংরেজি শিখে আর কতটুকু বদলাতে পারবে সে? কারো হাত ধরে চলে যাবার বয়স আর এখন তার নেই। কাজে বের হয়ে গেল জয়দেব।
শুয়ে বসে দিন কাটাচ্ছে মধুমিতা। হাতে কোনো কাজ নেই তার। হোমওয়ার্ক শেষ করে রেখেছে আগেই। ছেলেমেয়েরা টিভি দেখছে।

বিছানায় গড়াগড়ি দিলো মধুমিতা। এখন ঘুমানোর সময় নয় তবুও চোখ বন্ধ করলো সে। কিছুদিনের দেখা পারিপার্শ্বিকতা তাকে অনেকটা বদলে দিয়েছে। স্বামীর আজ্ঞাবহ হয়ে চার দেয়ালের মধ্যে বন্দি হয়ে থাকার কোনো মানে খুঁজে পায় না সে। বাড়ি থেকে মা বলেছে কিছু টাকা পাঠাতে কিন্তু এখন সে কোথা থেকে টাকা পাঠাবে? এখনই স্বামীর কাছে টাকা চাইলে সে মাইন্ড করতে পারে। দেশে ভাইগুলো বেকার ঘুরছে। তাদেরকে এখানে আনার চেষ্টা করতে হবে। অনেক কাজ তার। সামনে অনেক দায়িত্ব।

নিজের অজান্তে ঘুমিয়ে গেল মধুমিতা। প্রিয়ন্তি এসে ডাক দিলো মাকে। আজ যখন কোনো কাজ নেই সবাই মিলে বাইরে বেড়াতে বের হবে।

মেয়ের ডাকে চোখ মেললো মধুমিতা। কখন সে শুয়েছিল, কখন ঘুমিয়ে গেল মনে করতে পারছে না। ভাবনাগুলো কেমন যেন ধাক্কা খেল। মেয়েটা বজ্জাতের হাড্ডি। একটু ঘুমিয়েও শান্তি নেই। সারাদিন তার পিছে লেগে থাকে। একটু ভাবতে পর্যন্ত দেয় না।

জয়দেব বাসায় ফোন করলো। আগামী শনিবার গ্যারেজে গাড়ির কাজ করতে দিবে। সেদিন আর গাড়ি চালাবে না, সবাইকে নিয়ে ইউনিভার্সেল স্টুডিওতে যাবে।

আনন্দের বন্যা বয়ে যাচ্ছে ঘরে। কয়েকদিনের মধ্যেই তারা স্বপ্নের ইউনিভার্সসেল স্টুডিও দেখতে যাবে।

–তুমি যাবে না মা? প্রিয়ন্তি প্রশ্ন করলো।

–তোদের এত আনন্দ লাগলে তোরা যা। মুখে ভেংচি কেটে জবাব দিলো মধুমিতা।

প্রিয়ন্তির মনটা খারাপ হয়ে গেল। সে আশা করেছিল মা খুশি হবে। তিন ভাইবোন ষড়যন্ত্র করে বাবাকে রাজি করিয়েছে। আর এ মহিলা...।

–তুমি একটা বদরাগী মহিলা। বলেই প্রিয়ন্তি দ্রুত মায়ের সামনে থেকে সরে গেল।

খাটে উঠে বসলো মধুমিতা। চোখ লাল তার–তবে রে বজ্জাত মেয়ে। আমি বদরাগী? আমি আছি আমার ভাবনা নিয়া, ওরা আছে ওদের আনন্দ নিয়া। বাপও একটা, ছেলেমেয়েরা বললো আর অমনি রাজি হয়ে গেল। ঘরে যে আর একজন লোক আছে তাকে একটু জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজনবোধ করলো না? আসুক আজকে।

–আসলে কী করবা বাবাকে? প্রিয়ন্তি ড্রয়িংরুম থেকে জবাব দিলো।

–আমার মুখে মুখে কথা বলছিস প্রিয়ন্তি?

কাজ থেকে বাসায় ফেরে জয়দেব। আমেরিকায় মন্দা অবস্থার কারণে আয় আগের তুলনায় অনেক কমে গেছে। লোকজন এখন ট্যাক্সির বদলে পাবলিক বাস ব্যবহার করে। পয়সা বাঁচায়। প্রতিদিনই লোকজন চাকরিচ্যুত হচ্ছে। আয়-রোজির সে রমরমা অবস্থাটা এখন নেই। কোনো কোনো দিন গাড়ি ভাড়া, তেল খরচ বাদে শূন্য হাতে ঘরে ফিরতে হয়। অন্য কাজের কথা চিন্তা করে জয়দেব। যে-সব কাজের জন্য আগে মালিকগণ হন্যে হয়ে লোক খুঁজতেন, এখন সেসব কাজ পাওয়াও কঠিন হয়ে গেছে। আমেরিকার অবস্থা চরমে না পৌঁছলেও জৌলুসটা কমে গেছে অনেকাংশে। এসব ভাবিত করে জয়দেবকে। আবার সে ভাবে, সমস্যা তো তার একার নয়। ত্রিশ কোটি আমেরিকানের যা হবে, তারও তা-ই হবে।

বাসায় ঢুকেই জয়দেব কেমন যেন একটি থমথমে অবস্থা দেখতে পায়। কারো মুখে হাসি নেই। অসময়ে শুয়ে আছে মধুমিতা। ছেলেমেয়েদের কেউ বই পড়ছে, কেউ টিভি দেখছে। জয়দেব যে বাসায় ফিরেছে কেউ যেন তাকে দেখতেই পাচ্ছে না। হাত-মুখ ধুয়ে সোফায় বসল জয়দেব। প্রিয়ন্তি এসে বাবার গা ঘেঁষে সোফার কাছে দাঁড়ালো।

–সবাই এমন নীরব কেন রে মা? কিছু হয়েছিল নাকি? মাথা তুলে মেয়েকে প্রশ্ন করলো জয়দেব।

কাঁদো কাঁদো গলায় প্রিয়ন্তি জবাব দিলো–মাকে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দাও বাবা। এক রকম কেঁদেই দিলো প্রিয়ন্তি।

–কেন, কেন? কী করেছে তোমার মা? অবাক হলো জয়দেব।

–তুমি আমাদেরকে ইউনিভার্সেল স্টুডিওতে নিয়ে যাবে, মা এটা সহ্য করতে পারে না। তোমার ফোনের পরই মা আমার সাথে খারাপ ব্যবহার করছে। এবার কেঁদে দিলো প্রিয়ন্তি।

–হ্যাঁ বাবা, হ্যাঁ বাবা, মাকে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দাও। আমাদেরকে ইউনিভার্সেল স্টুডিওতে নিয়ে যাবে মা তা চায় না। সারাদিন কেবল বাংলাদেশে কথা বলে। চিৎকার দিয়ে কথা বলে, অসহ্য লাগে। মাকে পাঠিয়ে দাও। বললো জয়ন্ত। পড়ন্ত কিছু বললো না কিন্তু ভাইবোনের অভিযোগের সাথে তার সমর্থন আছে।

–আমার বিরুদ্ধে কমপেস্নইন দেয়া হচ্ছে না? আমাকে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেয়ার সুপারিশ? আমার পেটের সন্তান হয়ে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র? অনেকটা রুদ্রমূর্তি ধারণ করে শোবার ঘর থেকে উঠে এলো মধুমিতা। মায়ের আগমন টের পেয়ে প্রিয়ন্তি ও জয়ন্ত বাবার কাছে আশ্রয় নিলো।

–তোমরা নিজেদের ঘরে যাও, আমি বিষয়টা দেখছি। ছেলেমেয়েরা শোবার ঘরে চলে গেল। কটমট দৃষ্টিতে মধুমিতা তাদের দিকে তাকালো।

–ছেলেমেয়েরা কী বললো তুমি সেটাই বিশ্বাস করলে? আমার কী কোনো মূল্য নেই এই সংসারে? ঝাঁঝালো গলায় বললো মধুমিতা।

–ছেলেমেয়েরা কী বলেছে সে নিয়ে আমি তো তোমাকে কিছু বলিনি। তুমি এমন অগ্নিমূর্তি ধারণ করলে কেন? মনে হয় সব গিলে খাবে?

–অগ্নিমূর্তি ধারণ করবো না তো কী করবো? একটা ডিসিশন নিবা, আমাকে বলবা না? নাকি আমি এ ঘরের কেউ না?

–ঘরে ফিরেই তো দেখি মুখটা বাংলা পাঁচের মতো করে রেখেছো, তোমাকে কখন বলবো? তোমাকে ফেলে তো আমরা যাইনি। জাস্ট বলেছিলাম। মেয়ে ফোন ধরেছে, মেয়েকে বলেছি। মেয়ে কী তোমার কেউ না?

–না, আমার কোনো মেয়ে-টেয়ে নেই। আমার কাউকে লাগবে না। মধুমিতার রাগ যেন কমছে না।

–তুমি অযথা পরিবেশটাকে উত্তেজিত করছো মধু। তুমি যতটা রেগে আছ ততটা কিন্তু কিছুই ঘটেনি।

–তাতো বলবেই। বাপ-ছেলেমেয়েরা তো এক হয়ে গিয়েছো। আমি সবার শত্রু। ও কে, আমাকে টিকেট কেটে দাও, আমি বাংলাদেশে চলে যাই। তোমরা থাকো তোমাদের আমেরিকা নিয়ে।

–আমি যে বারো ঘণ্টা কাজ করে এলাম, ঘরে এসে একটু শান্তি পাবো না? আমার তো রূপসী একটা স্ত্রী আছে, নাকি? আর বলি, বাংলাদেশে কার সাথে এতো কথা বলো? সারাদিন এত কী কথা?
কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দেবার মতো অবস্থা। আরো তেজে গেল মধুমিতা।

–তুমি তো একটা চশমখোর লোক। আজ ক'মাস হলো আমেরিকা এলাম আমার মা-বাবার সাথে ভালো করে একটু কথা বলার সময় তো তোমার হয় না। তারা কী তোমার কাছে ডলার চায়? দু'মিনিট কথা বললে আর যেন কোনো কথা খুঁজে পাও না। আমার বাবা-মায়ের খবর তো আমাকে নিতে হবে, তাই না? মেয়ে আমেরিকা থাকে।

–মেয়ে আমেরিকা থাকে? মেয়ে যখন বাংলাদেশে থাকতো তখন মধুমিতা ছিল আমার স্ত্রী, মধুমিতা আমেরিকা আসাতে এখন তাদের মেয়ে? যতসব স্বার্থপর লোক। শেষ কথাটা বেশ জোরে বললো জয়দেব।

–কী, কী? আমার বাবা-মা স্বার্থপর? তুমি এত বড় কথাটা বলতে পারলে? কী স্বার্থপরতা করেছে তারা? বল, বল। স্বামীকে পারলে খেয়ে ফেলে মধুমিতা। তার চোখ দিয়ে যেন আগুন ঝরছে। কাঁপছে মধুমিতা।

–আজকের পরে ঐসব লোকজনদের কথা যেন এখানে না ওঠে। স্বার্থপর লোকজনদের আমার খুব ভালোই চেনা আছে। কেন, আমরা ফোন করে তাদের খবর নিতে যাব কেন? প্রয়োজন হলে তারা ফোন করে মেয়ের খবর নিক। বাংলাদেশ থেকে কী আমেরিকা ফোন করা যায় না? মেয়ের প্রতি দরদ থাকলে তো একদিন এক মিনিট ফোন করতে পারতো। কত টাকা লাগতো তাতে? ভিসার জন্য বছরে কতবার ঢাকা যাওয়া-আসা করতে হলো, একবার একটা লোককে পাওয়া যায়নি ঢাকা নিয়ে যাবার জন্য। যদি পকেটের টাকা খরচ হয়? আর জয়দেব যদি না দেয়? আমার কী সে-সব মনে নেই মনে করেছো? এখন তো বসন্তের কোকিলের অভাব হবে না। মেয়ে আমেরিকা থাকে, বাতাসে ডলার ভেসে বেড়ায়।

–তুমি কিন্তু আমার বাবা-মাকে অপমান করে কথা বলছো? আমি কিন্তু সহ্য করবো না। সব সহ্য করলেও...
–কী করবা তুমি? কে বলেছে তোমাকে ঐসব অবান্তর প্রসঙ্গ তুলতে? ভালো করে কীভাবে কথা বলবো তাদের সাথে? ইউনিভার্সিটি অব সাউদার্ন ক্যালিফোর্ণিয়া থেকে কথা বলার উপর ডিগ্রি নিয়ে এসে কথা বলবো তাদের সাথে? মেয়ে তো আমেরিকা এলো, নিমোকহারামের দলরা মেয়েকে, নাতি নাতনীকে ক'টাকা দিয়ে সাহায্য করছে? বাংলাদেশে কী একটা গামছাও পাওয়া যায় না? একটা গামছা দিয়েও তো বলতে পারতো, ধর এটা জামাইকে দিস। আসার পর থেকেই তো আমি দিয়ে যাচ্ছি। কখনো বলেছি যে আমাকে কিছু দাও? আমার কোনো আত্মীয় স্বজন গত বারো বছরে ঐ বাড়ির সীমানা দিয়ে গিয়েছে কখন? অথচ তাদের যত সমস্যা হয়েছে, আমাকেই সমাধান করতে হয়েছে। নিমকহারাম আমি না তোমরা? আর কখনো আমাকে তাদের সাথে কথা বলতে বলবে না। তারা আমার কেউ না। তাদের কাছে ফোন করে যে পয়সা নষ্ট করবো সে পয়সা গ্রামের একজন গরিব লোককে দান করলে দু'বেলা খেতে পারবে।
ফুটো বেলুনের মতো চুপসে গেল মধুমিতা। স্বামী যে এতটা ক্ষেপে যাবে তা সে বোঝেনি।
–তুমি কিন্তু এখন একটু বেশিই বলছো। আমি একটা কথা বলেছি বলে তুমি এতগুলো কথা বলবে? আমার বাবা-মা কী তোমাকে কখনো কোনো সাহায্য করেনি?
–কী সাহায্য করেছে? কী সাহায্য করেছে? আমারটা লুটেপুটে খাওয়া ছাড়া আমাকে কী সাহায্য করেছে? লুটেরার দল কোথাকার। স্বার্থপর। জানে শুধু পরেরটা চেটেপুটে খেতে।
মুখে বিষাদের ছায়া নেমে এলো মধুমিতার। সামনে তার এখন অনেক প্রজেক্ট। স্বামীর সহযোগিতা ছাড়া সে এসব বাস্তবায়ন করতে পারবে না। এখনই সে বিগড়ে গেলে বিপদ। নমনীয় হলো মধুমিতা।
–তোমাকে চা দেব? করুণ সুরে বললো মধুমিতা।
স্ত্রীর দিকে না তাকিয়েই জয়দেব জবাব দিলো তার চা লাগবে না। স্বামীর কাছে এসে বসলো মধুমিতা। কাঁধে হাত রাখলো।
–এত রাগ তোমার? এত অল্পতেই উত্তেজিত হয়ে যাও? ন্যাকামি করে বললো মধুমিতা।
–তুমি কিন্তু আমার রাগ বাড়িয়ে তুলছো। আমি আর চাইবো না কোনো কারণে এখানে শ্বশুর-শাশুড়ি প্রসঙ্গ আসুক। সে প্রসঙ্গ এলেই নানা কারণে ঝগড়া বাধবে, শান্তি বিনষ্ট হবে। আমি যেহেতু ভালো করে তাদের সাথে কথা বলতে পারি না আমি আর কখনো তাদের সাথে কথা বলবো না। আমি চাইবো, তুমিও তাদের সাথে কম কথা বলবে।
–এটা তোমার ন্যায় বিচার হলো? তুমি তোমার শ্বশুর-শাশুড়ির সাথে কম কথা বলতে পারো। না-ও বলতে পারো, তাই বলে আমি মেয়ে হয়ে মা-বাবার সাথে কথা বলবো না?
–বলবে, তবে সীমিত আকারে। তাদেরকে নিয়ে ঝগড়াঝাটি এ পর্যন্ত কম হয়নি। আমার রক্ত জল করে, কাজ করে পাঠানো টাকা কেন তাড়াতাড়ি খরচ হয়ে যেত, সংসারে অশান্তির মোমবাতি কেন জ্বলতো আমি খবর জানতাম শুধু শান্তি ভঙের আশংকায় কাউকে বলতাম না।
শক্ত হয়ে বসলো মধুমিতা–তুমি কী আমাকে সন্দেহ করছো? তোমার পাঠানো টাকা আমি মা-বাবাকে দিয়েছি? শেষ পর্যন্ত আমার মা-বাবার বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ?
–আমি পুরনো বাসুন্দি ঘাটতে চাই না। আমি কত টাকা পাঠিয়েছি আর তুমি তা কী কী কাজে খরচ করেছো আমি হিসাব চাইলে তুমি কিন্তু হিসাব দিতে পারবে না। ধীরে ধীরে শক্ত হয়ে যাচ্ছে জয়দেব।
–তোমার কাছে কোনো প্রমাণ আছে? তোমার আত্মীয়স্বজনেরা খবর পাঠাত তোমার কাছে আমি মা-বাবাকে গোপনে টাকা দিই? তখন টাকার হিসাব চাইলে না কেন? শেষ পর্যন্ত তুমি কিনা...। তারা লোক ভালো না ঠিক আছে, তাই বলে জামাই বাড়ির টাকা...?
–তখন চাইনি এখন চাইবো। হিসাব তো আর তামাদি হয় না। আমি কিন্তু ঐ শান্তি হরণকারী মানবজাতির কথা কিছুই বলিনি। তুমি বারবার তাদেরকে হেডলাইনে নিয়ে আসার অপপ্রয়াস চালাচ্ছো এবং ব্যর্থ হচ্ছোএবং ব্যর্থ হতেই থাকবে। আমার কাছে তাদের কোনো মূল্য নেই। বুঝলে? কোনো মূল্য নেই অ একটা লাল পেনির সমানও না ।

–কেন মূল্য নেই? কী ক্ষতি করেছে তারা তোমার? এতদিন জামাই একা আমেরিকা ছিল, এখন মেয়েও থাকে। তাদের একটা আশা-আকাঙ্ক্ষা থাকতে পারে না? চোখের জল, নাকের জল একত্র করে কেঁদে দিলো মধুমিতা। আমেরিকা প্রবাসী মেয়ে-জামাইর সংসারে তাদের আধিপত্য হারানোরসমুহ আশংকা। একেবারেই অলুক্ষণে লক্ষণ।

–এত নিষ্ঠুর কেমনে হও তুমি? তুমি যদি তাদের ছেলে হইতা তাইলে কী তাদের খবর নিতা না? বাম হাত দিয়ে মধুমিতা নাক মুছলো। জয়দেব শক্ত হয়েই বসে আছে।

–এইসব মায়াকান্না জয়দেব বহু দেখেছে। তারা আমার সারা জীবনের শান্তি হরণ করেছে। আবার তাদের কাছে নতজানু?

–মিথ্যা কথা বলবা না, বুঝলে? মিথ্যা কথা বললে ভগবান সইবে না। তারা তোমাকে ছেলের মতো জানে, বুঝলা? তারা তোমার শান্তি হরণ করলো কেমনে?

–জামাইকে ছেলের মতো জানাটা বিরাট দুরভিসন্ধি। জামাইকে জামাই মনে করলেই বরং ভালো। মা-বাবা তো ছেলের কাছে অনেক কিছু প্রত্যাশা করে। জামাইকে ছেলের মতো মনে করলে...

জয়দেবের কথায় আটকে গেছে মধুমিতা। পরাজিত দৃষ্টিতে সে স্বামীর দিকে তাকালো। নাক দিয়ে, চোখ দিয়ে জল পড়া বন্ধ হয়েছে তার।

–আজ মঙ্গলবার। নির্মলদার ছুটি। তাকে বাসায় আসতে বলেছি। একা একা বলছে জয়দেব কাউকে উদ্দেশ্য না করেই।

সম্বিত ফিরে পায় মধুমিতা। লোকটাকে একবেলা ভালো করে খাওয়ানো দরকার।

–আসতে চাইলে আসুক। না বলেছে কে? অজানার উদ্দেশ্যে বললো মধুমিতা।

–এসে যদি দেখে তথাকথিত শ্বশুর-শাশুড়িকে নিয়ে অযথা বাকযুদ্ধ হচ্ছে তাহলে মান-সম্মান থাকবে কিছু? এলে কী রাতে না খেয়ে যাবে? স্ত্রীর মুখের দিকে না তাকিয়ে বললো জয়দেব।

–রান্নাবান্না তো আছেই। অসুবিধা কী? মধুমিতাও অন্যদিকে তাকিয়ে বললো। শাড়ির আঁচল দিয়ে সে চোখ মুখ মুছলো।

সন্ধ্যার পর নির্মল বাবু জয়দেবের বাসায় এলেন। এটাই তার প্রথম আসা নয়। এর আগেও কয়েকবার এসেছিলেন। বিদেশে আপনজনের বড়ই অভাব। সঠিক বন্ধু নির্বাচন বেশ কঠিন কাজ। অনেকের সাথে বন্ধুত্ব হয়েছে আবার অকারণে বন্ধুত্ব ফাটলও ধরেছে। নানা ওলট-পালটের পর নির্মল বাবুর সাথেই বন্ধুত্ব কিছুটা দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে। আসার সময় প্রতিবারই তিনি দেশি রেস্টুরেন্ট থেকে মিষ্টি অথবা সন্দেশ নিয়ে আসেন। এবার বাংলাদেশ থেকে আমদানীকৃত রসগোল্লা নিয়ে এলেন।

মধুমিতা রান্না-বান্নায় ভালো। ফ্রিজে রাখা আগের রান্না বের করে সে মাইক্রো ওভেনে গরম করলেন এবং আসার সময় নিয়ে আসা শুঁটকি মাছ রান্না করলো। ঘরে প্রবেশ করেই নির্মল বাবু শুঁটকি মাছের গন্ধ পেলেন।

ছেলেমেয়েসহ জয়দেব ও নির্মল বাবু রাতের খাওয়া শেষ করলো। এরপর ছেলেমেয়েরা শোবার ঘরে গেলো এবং জয়দেব ও নির্মল বাবু বসে গল্প করতে লাগলো। মধুমিতা খাওয়া শেষ করে থালা বাসন ধুয়ে তাদের সাথে গল্পে যোগ দিলো।

–তারপর বৌদি, আমেরিকা কেমন লাগছে? আপনার ইংরেজি শেখা কতটুকু অগ্রসর হলো? প্রশ্ন করলো নির্মল বাবু।

মধুমিতাকে কোনো কথা বলতে না দিয়ে জয়দেব বললো–ইংরেজি ভালোই শিখেছে। আমেরিকায় সে উন্নতি করতে পারবে। হলিউডের ডাইলের পানি পেটে পড়েছে না?

রাগত দৃষ্টিতে মধুমিতা স্বামীর দিকে তাকালো। পারলে তার ঘাড় মটকে ধরে। নির্মল বাবু মধুমিতার এই রাগত চেহারা দেখলেন না।

–যত দ্রুত শেখা যায় ততই ভালো। একটু ইংরেজি না জানলে তো এ-দেশে কাজকর্ম করা যাবে না। নির্মল বাবু বললেন। এবার জয়দেব চুপচাপ।

–কাজের কথা মনে করে ভালোই করেছেন নির্মলদা। আমার একটা কাজ দরকার। যে কোনো কাজ হলেই চলবে। পরের উপর বসে বসে কতকাল খাবো। নির্মল বাবুর দিকে তাকিয়ে মধুমিতা বললো।

নির্মল বাবু জয়দেবের দিকে তাকালেন। তার চোখে অসংখ্য প্রশ্ন। স্বামী থাকতে নির্মল বাবুকে সে কেন কাজের কথা বলছে? এটা কী শুধুই কথার কথা নাকি এরই মাঝে খুনসুঁটি দেখা দিয়েছে। নাকি একজন আরেকজনের কাছে যেভাবে কাজের খবর নেয় এটাও তাই?

–আমার চেয়ে দাদার সাথেই লোকজনের পরিচয় ভালো। চাইলে তো দাদাই আপনাকে কাজ খোঁজ করে দিতে পারে। এবারো নির্মল বাবু জয়দেবের দিকে লক্ষ করে বললো।

–কী কাজ করবে এখনই? ক'লাইন ইংরেজি জানলেই কাজ করা যায় নাকি? আর কাজে গেলে ঘর সংসার সামলাবে কে? আমি তো দিনের বারো-তেরো ঘণ্টাই ঘরে থাকি না। বললো জয়দেব।

–ওনার কথা শুনবেন না তো নির্মলদা। আমি সিরিয়াসলি বলছি আমি কাজ করতে চাই। ছেলেমেয়েরা স্কুলে গেলে আমার আর কী কাজ? ছোটখাটো একটা কাজ করতে কয় লাইন ইংরেজি জানতে হয়? আমি যে দেশ থেকে এসএসসি পাশ করে এসেছি এবং এখানে ইংরেজি শিখছি ওনার সেটা গায়েই লাগে না। কথা না বলতে পারলে তো কেউ কাজে রাখবে না, তাই না? সংসারে উন্নতি হোক সেটা যেন তার ভালো লাগে না।

এবার নির্মল বাবু একবার মধুমিতার দিকে, একবার জয়দেবের দিকে তাকালো।

–দেখুন গভর্নরের পিএ'র একটা চাকরি দিতে পারেন কিনা। ইংরেজি তো ভালোই জানে। তাচ্ছিল্যের সাথে জবাব দিলো জয়দেব।

–তুমি কিন্তু আমাকে অবজ্ঞা করছো। আমি কী বলেছি গভর্নরের পিএ হতে চাই? যারা গভর্নরের পিএ হিসাবে কাজ করে তারা কী আমাদের মতো মানুষ না? আমার ছোটখাটো একটা কাজ হলেই চলবে নির্মলদা। আপনি দেখেন, পেলে আমাকে খবর দিবেন। রাগত দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললো মধুমিতা।

–খোঁজ খবর নিয়ে কাজ হয়তো একটা যোগাড় করা যাবে কিন্তু জয়দেবদা না বললে তা করি কী করে? আত্মবিশ্বাসহীনতার সাথে বললো নির্মল বাবু।

–উনি আর কী বলবে? আমি কতবার বললাম অন্তত পার্টটাইম একটা কাজের ব্যবস্থা করো, সে যে কত দুনিয়ার কথা আমাকে বলে তা আপনাকে কী বলবো? মেয়েরা কাজ করলে ঘরে লক্ষ্মী শ্রী থাকে না, ছেলেমেয়েদের আদর যত্ন হয় না। সংসারে অশান্তি দেখা দেয়, বেশি টাকার দরকার নেই, এত টাকা খাবে কে, আরো কত কি? তার কোন কথাটা সঠিক বলেন তো? অন্য সংসারের মহিলারা কাজ করে না? তাদের সংসারে কী শান্তি নাই? ছেলেমেয়েরা পড়ালেখা করছে না? আজব লোক একটা। কিছু কাজ করতে পারলে যে সংসারে কিছু বাড়তি পয়সা আসবে সেটা বোঝে না।

কিছুক্ষণ বলার পর থামলো মধুমিতা। খানিকক্ষণ নীরবতা। কেউ কোনো কথা বলছে না। একটু পর নির্মল বাবু উঠতে উদ্যত হলেন। রাত দশটার বেশি বাজে।

–আজকে উঠি জয়দেবদা। রাত তো অনেক হলো। সকালে তো আপনার কাজ আছে। আমারও কাজ আছে। বলেই নির্মল বাবু উঠে দাঁড়ালেন।

–কাজ নেই শুধু আমার। কথার মাঝে কথার ফোঁড়ন কাটলো মধুমিতা।

–কাজ একবার শুরু করলে আর থামতে পারবেন না বৌদি। যতদিন শুরু না করেন আরাম করে নিন।

–আমি গ্রামের মেয়ে। কাজকে ভয় পাই না। কাজ দিয়ে আপনি দেখেন না একবার।

নির্মল বাবু দরজার সামনে গেলেন। মধুমিতা ও জয়দেব তাকে বিদায় দিয়ে দরজা আটকে দিলো। ছেলেমেয়েরা এখনো ঘুমায়নি। মধুমিতা তাদের বিছানা ঠিক করে দিয়ে শুইয়ে দিলো। লিভিং রুমের লাইট অফ করে দিয়ে মধুমিতা শোবার ঘরে গেল। জয়দেব বিছানায় শুয়ে মাথার নীচে হাত দিয়ে কী যেন ভাবছে। লাইট অফ করে দিয়ে মধুমিতা ধপাস করে শুয়ে পড়লো।

–তুমি কিন্তু তোমার বন্ধুর সামনে আমাকে অপমান করেছো। বললো মধুমিতা।

–কীভাবে? অবাক হলো জয়দেব।

–কথায় কথায় তুমি আমাকে অবজ্ঞা করেছো যেন আমি একটা অপদার্থ। এভাবে কারো সামনে আমাকে অবজ্ঞা করবে না। তাহলে তোমার খবর খারাপ আছে। কর্কশ গলায় বললো মধুমিতা।

–তুমিও কিন্তু আমাকে অপমান করেছো। আমি থাকতে তুমি নির্মল বাবুকে চাকরির কথা বলতে গেলে কেন? কী ভাববে সে? ভাববে না যে আমরা অভাব অনটনে আছি? মহিলাদের এত চালাক হতে নেই।
–তোমাকে তো কতবার বলেছি আমাকে কাজে লাগিয়ে দাও। বসে থাকতে আমার ভালো লাগে না। আমার কথা তো তুমি কানেই তোল না।
–তুমি চাকরি করবে কী করবে না সে সিদ্ধান্ত তো আমি নিবো, নাকি নির্মল বাবু নিবে? লক্ষ করছি ইদানীং তুমি প্রায়ই আমার দোষ খুঁজে বেড়াও। আমার কিন্তু লাগে।
–তোমার লাগে, আমার লাগে না? তুমি বলতে চাও আমি একটা গেঁয়ো ভূত? আমাকে দিয়ে কিছু হবে না? লোকজনের সামনে আমাকে কিন্তু অবজ্ঞা করে কথা বলবে না।
–তাহলে কী তোমাকে মহারাণী বলে ডাকবো? দিলিস্নশ্বরী বা মহারাণী ভিক্টোরিয়া বলে? এত টনটনে মান-সম্মান কেন?
–টনটনে মান-সম্মান থাকবে না তো কী। আমি তো আর তোমার মতো না। অন্ধকারে কেউ কারো মুখ দেখতে পাচ্ছে না ঠিকই কিন্তু কথার ঝাঁজ কারো থেকে কারো কম নয়।
–আমার মতো না মানে? আমি কী? বলো আমার মতো না মানে কী? শক্ত হয়ে জয়দেব স্ত্রীকে খোঁচা দিলো।
–সময় হলেই বলবো তুমি কী।
–না, তোমাকে এখনই বলতে হবে আমি কী। বছর না ঘুরতেই তুমি আমাকে অপরাধীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাচ্ছো। কথায় কথায় আমার দোষ ধরছো।
–দোষ ধরলাম কোথায়? কথা বললেই দোষ ধরা হয়ে গেল? এত ইগো তো ভালো না। স্বামীর উল্টা দিকে শক্ত হয়ে শুয়ে আছে মধুমিতা।
–তুমি কিন্তু আমার সাথে খারাপ ব্যবহার করছো মধুমিতা।
–খারাপ হলে খারাপ। আমি তো গ্রামের ভূত, আমার কাছে আর কতটা ভালো ব্যবহার আশা করতে পারো?
–অকারণে তুমি আমার সাথে সম্পর্ক খারাপ করছো। তুমি খুব দ্রম্নত বদলে যাচ্ছ মধুমিতা।
–এতই যদি মান-সম্মানের বাহাদুরি তাহলে বাইরের মানুষ ঘরে আনো কেন? না আনলেই তো পারো। তাহলে তোমার স্ত্রীকে কেউ দেখতে পায় না।
–তুমি কিন্তু কথা অন্যদিকে নিয়ে যাচ্ছ। সে আমার অনেক দিনের পুরনো বন্ধু। তাকে বাসায় আনা এমন দোষের কিছু হয়নি। দোষ হলে আর আনবো না।
–আনবে! একশোবার আনবে। হাজারবার আনবে। তাকে একটা চাকরির খবর দিতে বলেছি, তার হাত ধরে তো আর চলে যাইনি।
–চলে যাওয়াও তোমার পক্ষে অসম্ভব কিছু না। তোমার সাম্প্রতিক মতিগতি আমার ভালো ঠেকছে না।
–তোমার তো ঐ সন্দেহ রোগটা অনেক পুরনো দিনের। সেটা আর এমন নতুন কি?
–আমি কিন্তু প্রথম কোনো কথা তুলিনি। খোঁচা মেরে মেরে কথা বলে তুমিই পরিস্থিতি জটিল করে তুলছো।
–খোঁচা মারবো না? অন্যলোকের কাছে নিজের স্ত্রীকে ছোট করে কথা বললে তোমাকে খোঁচা মারবো না? আরো কিছু মারা উচিত। এরপর যদি তুমি আমাকে অন্যলোকের কাছে ছোট করে কথা বলো দেখবো খোঁচা কাকে বলে। আমাকে তুমি গণনায় ধরো না। আমি কী নদী দিয়ে ভেসে এসেছি নাকি?
–তোমাকে গণনায় ধরি না বললো কে? সংসারে সদস্য সংখ্যা পাঁচজন, তার মধ্যে তুমি অন্যতম প্রধান। আমার স্ত্রী, তিন সন্তানের গর্বিত মা। শুধু আমি কেন, সরকারও তোমাকে গণনায় ধরবে। আমেরিকায় যতজন লোক গণনা করা হবে তার মধ্যে তুমিও একজন।
–দেখ, আমার রাগ কমাবে না কিন্তু। রাগ কমলে আমার ভালো লাগে না। আমি কাজ একটা ঠিক বের করে নিবো। আমার স্কুলের বন্ধুদেরকে বলেছি, তারাও খোঁজ-খবর নিচ্ছে। খবর পেলেই আমাকে জানাবে।

–আমার অনুমতি ছাড়া যদি কিছু করতে যাও হীতে বিপরীত হবে আমি বলে রাখলাম কিন্তু।
–হিতে তো বিপরীতই হয়। বিপরীতে তো আর হিত হয় না। আমি কাজ করতে পারলে তোমার অসুবিধা কী? তোমার সংসার ঠিক থাকলেই তো হচ্ছে। আমাকে নিয়ে তুমি এত ভয় পাও কেন? চোখ নাচিয়ে বললো মধুমিতা।
–এই তো একটা মূল্যবান প্রশ্ন করেছো। ভয় পাই কারণ তুমি বিগড়ে গেলে সংসারটা উচ্ছন্নে যাবে। ছেলেমেয়েরা ছারখার হয়ে যাবে। আমেরিকার সোনালি স্বপ্ন তামা বর্ণ হয়ে যাবে। একুল-ওকুল দু'কূলই যাবে।
–আমিই যে সব সর্বনাশ করবো এইটা তুমি কেমনে বুঝলা? তুমি কী জ্যোতিষী? আমাকে তোমার এত সন্দেহ কেন?
–তোমাকে সন্দেহ নয়, সতর্ক করা। গত ক'বছর পর্যন্ত এখানে দেখছি তো। মহিলাদের বেপরোয়া আচরণের জন্য অধিকাংশ সংসার চুরমার হয়ে গেছে।
–শুধু মহিলাদেরই দোষ দিবা না, বুঝলা? পুরুষগুলো কম বজ্জাত না। দেশে স্ত্রী-সন্তান রেখে এসে এখানে গোপনে বিয়ে করে। নিজের স্ত্রী থাকতে পরের স্ত্রী নিয়ে ইটিস পিটিস করে। শুধু মহিলাদেরই দোষ না। আমি তোমাকে কথায় কথায় সন্দেহ করি না। করি? বল করি? ঝাঁঝালো কণ্ঠস্বর মধুমিতার।
–আমি সন্দেহের কিছু করলে তো বলবা। না করলে বলবা কী করে?
–তবে আমি সন্দেহের কী করেছি? আমি কাজ করতে চাই এটাই তোমার সন্দেহ? কাজ করে টাকা-পয়সা মা-বাবাকে পাঠিয়ে দিবো?
–অধিকাংশ মহিলা গোপনে এ-কাজটি করে এবং সংসারে ফাটল ধরায়। ডজন ডজন প্রমাণ আছে। তোমার কাজ করার অতি আগ্রহ সন্দেহজনক।
–কাজ করলাম না, বেতন পেলাম না, আগেই মা-বাবার জন্য পাঠিয়ে দিলাম? দারুণ তো তোমার অভিযোগ। তুমি তো একটা জিনিয়াস। কত ডলার পাঠালাম?
–তুমি কিন্তু সবকিছু আগ বাড়িয়ে বলছো। আমি যা কিছুই বলি তুমি তুড়ি মেরে উড়িয়ে দাও। এটা কিন্তু ঠিক না।
–কোনটা সঠিক আর কোনটা সঠিক না তা বোঝার মতো যথেষ্ট জ্ঞান আমার হয়েছে। তোমার থেকে আমাকে জ্ঞান নিতে হবে না।
–তুমি কিন্তু সৌজন্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছ মধুমিতা। তুমি আমাকে কটাক্ষ করছো। বেশি বাড়াবাড়ি করলে পাখা না গজাতেই দেশে পাঠিয়ে দিবো।
–এত সোজা না। গ্রিনকার্ড আছে আমার। আইন কেবল তোমার একার জন্য না, আমার জন্যও। এদেশে মেয়ে পুরুষ সমান সমান।
–তাহলে তোমার খুঁটির জোর তোমার গ্রিনকার্ড, তাই না? আমাকে এখন আর প্রয়োজন নাই?
–আমি কী বলেছি আমার খুঁটির জোর গ্রিনকার্ড?
–এই যে বললে আমার গ্রিনকার্ড আছে? বলোনি?
–বলেছি। তো কী হয়েছে? যেটা আছে সেটা বলতে অসুবিধা কী? তোমার আছে না? তুমিও লোকজনকে বলে বেড়াও আমার গ্রিনকার্ড আছে।
–আমি তোমার রোগটা এখনো ধরতে পারিনি। ধরতে পারলেই ওষুধ দিবো। এমন ডোজ দিবো যে তুমি গ্রিনকার্ডের কথা ভুলে যাবে। বলি, গ্রিনকার্ড কার কারণে পেয়েছো?
–যার কারণেই পাই। এখন চাইলেই তুমি আমাকে পাঠিয়ে দিতে পারবে না। সেই দিন শেষ। বুঝলা?
–পাখা তাহলে গজিয়ে গেছে? ধরাকে সরা জ্ঞান হচ্ছে? এজন্যই অনেকে ছোটলোকের জাত স্ত্রীকে এদেশে আনে না।
–আমার জাত তুলে কথা বলেছো তো তোমার শেষ। আমি আগুন জ্বালিয়ে দিবো। আমার জাতে কী করেছে? মধুমিতার গলার আওয়াজ বেড়ে গেল।
–রাত হয়েছে, আস্তে কথা বলো।

–কার ভয়ে আস্তে কথা বলবো? আমার জাত তুলে কথা বলবা আর আমি আস্তে কথা বলবো? মধুমিতার গলার আওয়াজ আরো বেড়ে গেল।

দরজায় টোকা দিলো প্রিয়ন্তি। –তোমরা কী থামবে? আমরা ঘুমাতে পারছি না।

বিব্রতবোধ করলো জয়দেব–এখন হলো তো? বেআক্কেল মহিলা। কান্ডজ্ঞান যদি থাকতো। কোন পাপ আমি করেছি কে জানে? ভিতরে ভিতরে দেখি এই মহিলা বজ্জাতের হাড্ডি। এখনই ধরাকে সরা জ্ঞান করছে।

–তুমি কিন্তু আমাকে একের পর এক হেরেসমেন্ট করেই যাচ্ছ। এটা ডোমেস্টিক বায়লেন্স। আমি আইনের আশ্রয় নিতে পারি।

বিছানায় লাফ দিয়ে উঠে বসলো জয়দেব। লাইট জ্বালালো সে। স্ত্রীর দিকে কড়া চোখে তাকালো; মধুমিতা উল্টা দিকে শুয়ে আছে। ভাবলেশহীন সে।

–হেরেসমেন্ট! ডোমেস্টিক ভায়লেন্স! এন্দুর? আমাকে আইনের ভয় দেখায়? পুলিশ ডাকবা নাকি? ডাকো। পুলিশ ডেকে বলো আমাকে হেরেসমেন্ট করেছে। পুলিশ আমাকে ধরে নিয়ে যাক। মজা দেখ।

–যখন দরকার হয় তখন ডাকবো। বাড়াবাড়ি করলে ডাকবো না? মধুমিতাকে আঙ্গুল দিয়ে পেটে জোরে খোঁচা দিলো জয়দেব–তোমার সমস্যাটি কী বলবে? কেন তুমি এমন রাবিশ ব্যবহার করছো?

–আমার কোনো সমস্যা নাই। লাইট অফ করো, আমি ঘুমাবো।

আবার দরজায় টোকা। তোমরা চুপ করবে বাবা? আমরা ঘুমাতে পারছি না। আমরা কী বাইরে চলে যাব? জয়ন্ত বললো । পড়ন্ত কিছু বলছে না। সে পিটপিট করে দেখছে ভাইবোন কী করছে।

লাইট অফ করে দিলো জয়দেব। স্ত্রীর বিপরীত দিকে শক্ত হয়ে শুয়ে আছে সে। ঘুম আসছে না তার। তার আশঙ্কা কী সত্যি হতে যাচ্ছে? মধুমিতা কেন তার সাথে এমন ব্যবহার করছে তা সে বুঝতে পারছে না। সংসারে কোনো অভাব নেই। কোনো না কোনোভাবে সে তো সংসার চালিয়ে নিচ্ছে। তারপরেও মধুমিতা চাকরি করতে চায় কেন? সংসারে বাড়তি আয় করে আরো বেশি বেশি স্বাচ্ছন্দ্য আনতে চায়, নাকি অন্য কোনো উদ্দেশ্য আছে মধুমিতার? সে তো একের পর এক খারাপ ব্যবহার করেই যাচ্ছে। বছর ঘুরতে না ঘুরতে মধুমিতা এমন বদলে গেলে বাকি দিনগুলো কেমন করবে সে? তবে কী স্কুলে গিয়েই তার চোখ ফুটে গেল? নাকি অন্য কোনো অসভ্য মহিলাকে অনুসরণ করছে সে? আমাকে আইনের ভয় দেখাতে শুরু করেছে। অনেকদূর এগিয়ে গেছে মধুমিতা। গ্রিনকার্ডের অহংকার দেখাচ্ছে। বুঝে গেছে যে এদেশে তার একটা অবস্থান তৈরি হয়ে গেছে। কেউ কী গাইড করছে মধুমিতাকে? তা না হলে এত সকালে সে কী করে নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হলো? অসংখ্য প্রশ্ন জয়দেবকে গ্রাস করছে। প্রশ্নের পর প্রশ্ন, কোনো জবাব নেই।

মধুমিতা স্বামীর বিপরীত দিকে শক্ত হয়ে শুয়ে আছে। তার মধ্যে কোনো প্রকার অনুশোচনা নেই। স্বামীর সাথে ভালো ব্যবহার করলো নাকি খারাপ ব্যবহার করলো এ নিয়ে সে ভাবিত নয় মোটেও। সারা জীবন স্বামীর আজ্ঞাবহ হয়ে থাকতে হবে কেন তার কোনো মানে খুঁজে পায় না সে। এমন একটা স্বাধীন দেশে অন্য মহিলারা কেমন স্বাধীন হয়ে চলাফেরা করে আর তার স্বামী যেন তাকে কলা বৌ বানিয়ে রাখতে চায়। অন্য সব মহিলা চাকরি করে নিজের স্বাধীন মতো খরচ করে। আর তার স্বামী তাকে চার দেয়ালের মধ্যে বন্দি করে রাখে। চার দেয়ালের মধ্যেই যদি বন্দি থাকতে হবে, তবে আর আমেরিকা কেন? দেশেই তো থাকা যেত।

তুমি রাগ হও আর খুশি হও সেটা আমার দেখার বিষয় নয়। চাকরি আমাকে একটা করতেই হবে, সেটা যেমনই হোক। কিছু ডলার আমাকে রোজগার করতে হবে, মা-বাবাকে পাঠাতে হবে। তারা আমার দিকে চেয়ে আছে। মেয়ে আমেরিকা থাকবে আর মা-বাবা দেশে একটু আরাম করতে পারবে না এটা কেমন কথা? তোমার মা-বাবা যেমন আমার মা-বাবাও তেমন। তাদেরকে আমেরিকা আনতে পারি বা না পারি তাদেরকে কিছু ডলার না পাঠাই কী করে? তোমার কাছে চাইলে তো হাজারটা অনুযোগ তুলবে। নন্দঘোষেরও এত দোষ নেই। যত দোষ আমার মা-বাবার। জামাইকে সাহায্য সহযোগিতা করেনি, করেনি তো করেনি। কী করা যাবে তাদের? আমি কী তাদেরকে অস্বীকার করতে পারি? ঐ একটা সূত্র ধরে আমি তাদেরকে মোটেও বঞ্চিত করতে পারিনা। মনে মনে ভাবছে মধুমিতা।

জয়দেব সম্ভবত ঘুমিয়ে গেছে। এখন সে চিৎ হয়ে শোয়াতে তার একটা হাত মধুমিতার গায়ে পড়লো।

–আমার গায়ে যেন কেউ হাত না দেয়। স্বামীর হাতটা সরিয়ে রাখলো মধুমিতা। স্বামীর দিকে ফিরলো সে। জয়দেব আস্তে আস্তে নাক ডাকছে। মধুমিতা বুঝলো জয়দেব ঘুমিয়ে গেছে। আস্তে করে সে স্বামীর গায়ে হাত রাখলো। যেখানে হাত রেখেছে সেখানেই আছে। জয়দেব হাত সরাচ্ছে না। তার মানে সে ঘুমিয়েছে। রাগ বাড়লো মধুমিতার এত সকালে কেন সে ঘুমিয়েছে? ঝগড়া করে পারবে না বলে? আমার সাথে পারবে তুমি? চিনলে না তো মধুমিতা কী জিনিস। মনে মনে বললো মধুমিতা।

স্বামীর গায়ের উপর থেকে নিজের হাতটা সরিয়ে নিলো মধুমিতা। আবার অন্যপাশ ফিরলো সে। এবার আস্তে আস্তে শব্দ করেই বলছে সে–ঘুমিয়ে গেলে কেন? ঘুমিয়ে গেলে কেন, অ্যাঁ? আমার ভয়ে আগে আগে ঘুমিয়ে গেছো? পারবে না তো আমার সাথে। ঘুমাও আর যা-ই করো কাজ কিন্তু একটা আমাকে করতেই হবে। একবুক স্বপ্ন নিয়ে মা-বাবা আমাকে এই আমেরিকা পাঠিয়েছে। নিজেদের বাড়ি তো দালান করেছো, পারলে না আমার মা-বাবাকে একটা ঘর করে দিতে? এতগুলো বছরে পারলে না আমার একটা ভাইকে আনতে? একটু খোঁজ-খবর নিয়েই দায়িত্ব শেষ। রূপালি বৌদি চাকরি করে গোপনে নিয়মিত তার মা-বাবাকে টাকা পাঠায় আমার কাছে গল্প করে। আর আমি? ঘোমটা দিয়ে ঘরে বসে আছি। আজ কতগুলো মাস হয়ে গেল মা-বাবাকে একটা ডলার পাঠাতে পারলাম না। দেশে থাকতে যা পারতাম দিতাম, এখন সেটাও পারি না। উনি আমাকে গৃহবন্দি করে রাখবে। গৃহবন্দি হয়ে থাকার জন্য তো আমেরিকা আসিনি।

আবার পাশ ফিরলো মধুমিতা। জয়দেব নাক ডাকছে। চিৎ হয়ে ঘুমিয়ে আছে সে। সারাদিন কঠিন পরিশ্রম করে এসেছে।

–এখন তো টেনে নিয়ে বাইরে ফেলে দিয়ে এলেও টের পাবে না। এত কথা বলছ যে এখন ঠকাও না আমাকে? তর্ক করো না? তর্ক না করে ঘুমিয়ে গেলে কেন? আমি কাজ করতে গেলে আমাকে যদি বাধা দাও আমি ছেলেমেয়ে নিয়ে আলাদা বাসায় থাকবো। সরকারি ভাতা খাবো। আয় যা করবো গোপন রাখবো। অনেকেই তা করে। মুনমুনের মা বলেছে আমাকে। তারা সরকারি ভাতা পায়। অফিসে বলেছে স্বামী কোনো খোঁজ-খবর নেয় না। উড়নচন্ডি, বাউন্ডেল, ভবঘুরে এসব মিথ্যে বলে সরকারি সাহায্য নিয়ে দিব্যি আছে। দেশেও মাসে মাসে ডলার পাঠায়। স্বামী ট্যাক্স ফাঁকি দিয়ে কাজ করে। সুতরাং সরকারি খাতায় কাজের হিসাব নেই। দরকার হলে আমিও তাই করবো। সুযোগ থাকলে ছাড়বো কেন? তোমার মতো মহৎপ্রাণ লোকেরা আমেরিকা কিছু করতে পারবা না। ঘোড়ার ডিমও করতে পারবা না। রূপালি বৌদি বলে, সৎলোকেরা সংসারে কেন? তাদের জন্য রামকৃষ্ণ মিশন। গেরুয়া রঙয়ের পোশাক পরবে আর নিরামিষ খাবে। সংসারের কোনো মোহ তাদের টানবে না। সংসারে থেকে সৎলোক হতে চাওয়া ভন্ডামি। ঠিকই বলে রূপালি বৌদি। একটু থামলো মধুমিতা।

–এত কথা বলছি যে এখন জবাব দাও। স্বামীকে মৃদু খোঁচা দিলো মধুমিতা। জয়দেবের কোনো সাড়া শব্দ নেই। সে নাক ডাকছে।

–কার সাথে কথা বলছি আমি? লোকটা তো ঘুমে অচেতন। ঘুম আর মরা সমান কথা। সজাগ থাকলে কী একটা জবাবও দিতো না? স্বামীকে ঝাপটে ধরলো মধুমিতা।

কাজটা ভুল হয়ে গেছে। খোঁচা মারাটা ঠিক হয়নি। লোকটা তো আসলেই ঘুমায়। স্বামী তো। এতগুলো কথা কী দিনের বেলা বলতে পারতাম না? সে তো আর পালিয়ে যাবে না। আমাকে যে মাঝে মাঝে সে উজবুক বলে, ঠিকই বলে। কয়েক কথা বলে সে ঠিকই থেমে গেলো, আর আমি বকবক করেই যাচ্ছি। কে শুনছে আমার বকবকানি? যাকে বলা সে তো এখন ঘুমের রাজ্যে। ক্ষমা করে দিয়ো গো। মনে মনে বললো মধুমিতা।

নিজের উপর আবার রাগ হলো মধুমিতার। মনে মনে ক্ষমা চাইলে কী কেউ শুনতে পায়? স্বামী তো আর ঈশ্বর নয় যে মনে মনে বললে শুনতে পাবে। তবে কী ক্ষমা চাওয়ার জন্য স্বামীকে জাগাবে সে? এবার নিজের গালে নিজে চটকানা মারতে ইচ্ছে করলো মধুমিতার। বকবক করে, খোঁচা মেরে যে ভুল সে করেছে আবার তাকে জাগিয়ে ক্ষমা চেয়ে আর একটা ভুল করবে সে? এ রাত কী আর ভোর হবে না? ক্ষমা কী আর চাওয়া যাবে না?

লোকই একটা। ঘুমালে আর খবর থাকে না। পাশে যে আরো কেউ আছে খবরই থাকে না। স্বামীকে টেনে নিজের দিকে পাশ ফিরালো মধুমিতা। এখন আর জয়দেব নাক ডাকছে না।

স্বামীর বুকের কাছে মাথা নিলো মধুমিতা। নিজের নাক থেকে নিঃসৃত গরম বাতাস লাগছে স্বামীর বুকে। মুখ ফিরিয়ে নিলো সে। লোকটাকে বারবার কষ্ট দিচ্ছে সে। মুখ সরিয়ে স্বামীর গায়ে হাত বুলিয়ে দিলো। স্বামী তো। নিজের স্বামী বলেই কথা। দেশে থাকলে আরো কত ঝগড়াঝাটি হতো না? আবার তো মিলমিশও হতো। ঝগড়াঝাটি হলেই যে স্বামীকে তার ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করতে হবে আর তো কোনো মানে হয় না।

স্বামীকে আবার আলতো করে জড়িয়ে ধরলো মধুমিতা। ঠোঁটের কাছে ঠোঁট নিলো। হালকা করে ঘর্ষণ দিলো।

উহু, আহা শব্দ করলো জয়দেব। কিছুক্ষণ আগের ঝগড়াঝাটি কোথাও উড়ে গিয়ে দু'জন কখন যে আবার একাকার হয়ে গেল তারা বলতে পারবে না।

৩

কয়েক মাস পর। প্রিয়ন্তি, জয়ন্ত ও পড়ন্ত এখন রেগুলার স্কুলে যাচ্ছে। ভাষাগত সমস্যা তাদের রয়েই গেছে। তারপরেও তারা এখন কোনো রকমে চালিয়ে নিতে পারে। মধুমিতা যেটুকু ইংরেজি শিখেছে তাতে ছোটখাটো একটা কাজ করতে তেমন বেগ পেতে হবে না। কাজ করার কথা এখানো সে ভোলেনি। জয়দেব কাজে যাবার পর মধুমিতা স্কুলে যায়। সুতরাং সে কখন যায় আর কখন আসে বা স্কুলে গিয়ে কী করে তা জয়দেবের জানার সুযোগ নেই।

আজ মধুমিতার স্কুল বন্ধ। অলস সময় কাটাচ্ছে সে। ছেলেমেয়েরা সবাই স্কুলে। জয়দেব তো সকাল বেলাই কাজে চলে গেছে। দুপুরে সময় পেলে কোনো কোনো দিন খেয়ে যায় নতুবা সন্ধ্যায় বাসায় ফেরে।

রূপালিকে ফোন করলো মধুমিতা। মাঝে মাঝে সে রূপালির থেকে বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ নেয়। রূপালিকে বাসায় আসতে বললো মধুমিতা।

রূপালি ও মধুমিতার বাসা রাস্তার এপার-ওপার। আসতে তার সময় লাগেনি।

রূপালিকে চা নাস্তা দিলে মধুমিতা। নিজেও নিলো। মুখোমুখি বসলো দু'জন। ছোট ছেলেকে খেলনা দিয়ে বসিয়ে দিলো রূপালি।

-তারপর আপনাকে যে কারণে ডেকেছি বৌদি। আপনি তো আমার বিষয়ে সব জানেন। ফোনে কী আর সব কথা বলা যায়? সামনাসামনি কথা বলার মজাই আলাদা।

-তা যা বলেছেন। আমারও আজ ছুটি। ওর বাবা কাজে চলে যাবার পর একা একা তেমন কিছুই করার ছিল না। এমন সময়ই আপনার ফোন।

-এখন আমার তো ইংরেজি শেখা প্রায় শেষ। একটা কাজ করার মতো কথাবার্তা আমি এখন জানি। কিন্তু সমস্যা হলো প্রিয়ন্তির বাবা আমাকে কাজ করতে দিবে না। তার এক কথা, আমি কাজে গেলে সংসার উচ্ছন্নে যাবে।

-যতসব আজগুবি কথাবার্তা। আমি আমার এই ছেলেটাকে ওর বাপের কাছে রেখে কাজে যাই না? আমাদের সংসার কী উচ্ছন্নে গেছে? পুরুষ মানুষের সব কথা শুনতে নেই। আমি তো ওর বাবাকে একদম পাত্তা দিই না। আমার যা ইচ্ছে হয় করি। এদেশের আইন জানেন? মেয়েরাই এখানে সব। এক ধমক দিই, চুপ করে বসে থাকে। প্রথম প্রথম আমাকেও বলেছিল তোমার চাকরির দরকার নেই। কে শোনে কার কথা?

-তারপর কীভাবে রাজি করালেন? আগ্রহ ভরে প্রশ্ন করলো মধুমিতা।

-রাজি কী আর হয়? রাজি হতে বাধ্য করেছি। কী করবো বলেন-দেশে ফোন করলে মা বলে টাকা দাও, বাবা বলে টাকা দাও, ভাইবোনেরা বলে এটা দাও, ওটা দাও। তাদের দাবির তো আর শেষ নেই। আমেরিকা থাকি। নাই, নাই, পারবো না একথা কী করে বলি? বাজার করতে গিয়ে ওর বাবার চোখ ফাঁকি দিয়ে ২/৪ ডলার যা মারতে পারি তাতে আসলে কিছুই হতো না। বরং এ নিয়ে ঝগড়া-

ঝাটি হতো। অশান্তি হতো। শেষে একটা কাজ করতে বাধ্য হলাম। এখন যা আয় করি কিছু ওর বাবাকে দিই, আর বাকিটা দেশে মা-বাবার কাছে পাঠাই। ভালো না?

-দেশে যে পাঠান, ওর বাবা কিছু বলে না? মুখের কাছে মুখ নিয়ে বললো মধুমিতা। যেন সে রূপালির ইন্টারভিউ নিচ্ছে।

-প্রথম প্রথম বলতো। এখন আর বলে না। আমি তো রোজগার করে পাঠাই। চুরি তো করি না। জামাই তো আর শ্বশুর-শাশুড়িকে দিবে না। মেয়েকেই দিতে হবে। তাই না? দৃঢ়তার সাথে বললো রূপালি। যেন সে সঠিক কাজটিই করছে এবং এটাই কর্তব্য।

-আপনার কথা আমার খুব পছন্দ হয় বৌদি। আপনার সমস্যা, আমার সমস্যা প্রায় একই রকম। দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলো মধুমিতা।

-সমস্যা দেখলেন কোথায়? আমেরিকা এসেছেন আনন্দ ফূর্তি করবেন, জীবনটাকে উপভোগ করবেন। আমিও প্রথম প্রথম চুপ করে থাকতাম। ওমা, স্বামী তো দেখি আমাকে পেয়ে বসেছে। এরপর আলাপ হলো রাসেলের মার সাথে। আপনি অবশ্য তাকে চিনবেন না। সে আমাকে পরামর্শ দিলো, এটা আমেরিকা। সবার স্বাধীনতা এখানে সমান। স্বামী একটা থাকলে ভালো, না থাকলে এমন কিছু হয় না। আমরা তো আর অতটা পারি না। তার কথামতো চাকরি শুরু করলাম। অবশ্য এ নিয়ে যে ঝগড়া হয়নি তা নয়। কী করবে সে? হয় ডলার দাও না হলে কাজ করতে দাও। ডলার না দিয়ে কাজ করতে দিয়েছে। এখন আমি কাজে যাই সে ছেলে রাখে, আমি আসি সে যায়। কী শান্তি, তাই না? নিজের মতো করে খরচ করি। হাড় কিপটা লোক একটা। জানেন, আমাকে কিছু কিনে দিতে চাইতো না। এখন আমি নিজে আটিশিয়া গিয়ে সোনা কিনে নিয়ে আসি। এই, আপনারা আসার আগেও এগারশো বারশো ডলারের সোনা কিনলাম। দেশে মা-বোনের জন্য পাঠালাম। আরো কিনবো। জীবনটা তো দু'দিনের। কী বলেন বৌদি?

-বলেন কী বৌদি? আমি তো ভয়ে এক পা আগাই তো দু'পা পিছাই। আপনার কথা শুনে আমার ডর-ভয় দুর হয়ে গেছে। দেখুন তো আমেরিকা হলো স্বাধীন দেশ, এখানে এসে পরাধীন থাকলে চলে? আপনি বলুন, আমি শুনছি। দেশের থেকে আসার সময় নিজের হাতে চালতার আচার বানিয়ে এনেছিলাম, দিবো একটু? রূপালির চোখে চোখ রেখে বললো মধুমিতা। রূপালির তিন বছরের ছেলে ফ্লোরে বসে খেলা করছে। মধুমিতা উঠে ফ্রিজের কাছে গেল। চালতার আচার নিয়ে ফিরে এলো।

-আচার খেতে আমার কোনো অরুচি নেই বৌদি। মুখে আচার দিয়ে বললো রূপালি।

-তারপর বলেন আমার এখন কী করণীয়? মধুমিতা বললো। সেও আচার খাচ্ছে।

-কী করবেন, চাকরি একটা খুঁজে নিবেন। আমেরিকায় এসে বসে থাকার তো মানে হয় না। যে, যেভাবে পারছে টাকা বানিয়ে নিচ্ছে। এটা হলো টাকা বানানোর দেশ। মুনমুনের মাকে চিনেন? সামনের দিকে মাথা ঝাকিয়ে মধুমিতা জবাব দিলো যে সে মুনমনের মাকে চিনে।

-ফাঁকিবাজির যদি কোনো বুদ্ধি দরকার হয় তাহলে তার সাথে আলাপ করবেন। যত রকমের বুদ্ধি আপনার দরকার হবে দিতে পারবে সে। যত রকমের সরকারি সাহায্য আছে সব খায়। অন্যদিকে দু'জনেই ক্যাশ নিয়ে কাজ করে। বলে কিনা বেকার। কাজ পায় না। চেক নিয়ে কাজ করলে তো প্রমাণ থাকে, ক্যাশ নিয়ে করলে প্রমাণ থাকে না।

-বুঝলাম না তো বৌদি। আরো একটু বুঝিয়ে বলুন।

-আচ্ছা, আচ্ছা বলছি। আপনি কোথাও কাজ করে যদি ক্যাশ টাকা বেতন নেন তাহলে সেটা অবৈধ। সরকারকে আপনি ট্যাক্স দিলেন না। আর যদি চেক নেন তাহলে আপনি ট্যাক্স দিতে বাধ্য এবং তার একটা প্রমাণ থাকবে যে বছরে আপনি কত টাকা আয় করলেন। বছর শেষে আপনাকে ট্যাক্স ফাইল করতেই হবে। আপনি যদি প্রমাণ করতে পারেন যে আপনি বেকার তাহলে আপনি সরকারি অনেক সাহায্য পাবেন।

-আমি তো বেকারই। মহা বেকার। আমি কী কোনো কাজ করি নাকি? রূপালির দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললো মধুমিতা।

-তাহলে একদিন সোস্যাল অফিসে গিয়ে আবেদন করে আসুন। কিছু না কিছু পাবেন। আর যদি কাজ করেন তাহলে গোপন রাখবেন। ক্যাশে বেতন নিবেন, তাহলে আর কোনো প্রমাণ থাকবে না। আমি তো চেক নিই না। বেতন যা পাই। সব ক্যাশ নিই। সরকারের খাতায় আমি বেকার। এবার

বুঝলেন তো? আস্তে আস্তে সব বুঝবেন। একসাথে কী আর সব বোঝা যায় নাকি। আত্মবিশ্বাসের সাথে বললো রূপালি। তার বলার ধরন মধুমিতাকে মুগ্ধ করছে।
–আপনার মাথায় তো অনেক বুদ্ধি বৌদি। মধুমিতা বললো। আত্ম অহংকারে রূপালি যেন ফেটে যাচ্ছে।
–মুনমুনের মার কথা কী যেন বলছিলেন? প্রশ্ন করলো মধুমিতা।
–আরে সে এক ইন্টারেস্টিং কাহিনী। মুনমুনের বাবাকে না জানিয়ে মুনমুনের মা গোপনে দেশে তার মা-বাবার জন্য টাকা পাঠাত। একবার কীভাবে যেন ধরা খেল। সে নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এমন ঝগড়া বাঁধল যে ছাড়াছাড়ি হবার পথে। শেষে আবার কী করে যেন আপোস হলো। আপনারা আসার আগে এ ঘটনা। এখানে এমন লোক নেই যে না জানে।
মুখ অন্ধকার হয়ে গেল মধুমিতার। নিজেকে নিয়ে সে অলুক্ষণে চিন্তা করলো। যদি ধরা খাই।
–কিছু ভাবছেন বৌদি? রূপালি প্রশ্ন করলো।
সম্বিত ফিরে পেলো মধুমিতা–না, না কী ভাববো? বাঙালিরা যে এত দুষ্টলোক আগে তো জানতাম না। মধুমিতা নিজেকে অতি বাঙালি প্রমাণের চেষ্টা করছে।
–আপনি তো কেবল এলেন আরকি। আরো কত খবর যে পাবেন। মুনমুনরা কী করেছে জানেন? ট্যাক্স রিটার্নের সময় প্রকৃত আয় গোপন করেছিল। পরে সরকারি অডিটে তা ধরা খায়। সে নিয়ে যে কত কেলেঙ্কারি। এত লোভ কেন? সব একসাথে খেতে চায়। আমরা আবার সেসব করি না বৌদি। পারতে আমরা এখানকার বাঙালিদের সাথে তেমন একটা মিশি না। ঝগড়াটে জাতি একটা। মহিলাগুলো তো আরো খারাপ। শুধু ওর কথা তারে, তার কথা ওরে বলে বেড়ায়। সুযোগ পেলেই হলো। প্রয়োজনে কাজ বন্ধ করে হলেও একজনের কথা আর একজনকে বলবে। কানকথা না বলে থাকতেই পারে না। এই আমাকে দেখেন, কখনো কারো কথা কারো কাছে বলি না।
কিছুটা ভাবিত হলো মধুমিতা। তার কপালে চিন্তা রেখাটা ফুটে উঠলো। সে নিজে যে একজন মহিলা এবং রূপালিও যে একজন আপাদমস্তক যুবতী মহিলা এবং উভয়েই যে বাঙালি এটা বিশ্বাস করতে তার কাছে যেন খানিকটা খটকা লাগছে। মধুমিতা কোনো কথা বলছে না। সে কেবল শুনেই যাচ্ছে।
–কিছু বলছেন না যে বৌদি? আমি তো একাই বলে যাচ্ছি। রূপালি বললো।
টেলিফোন বেজে উঠলো। মধুমিতা টেলিফোন রিসিভ করে কথা বলে আবার এসে রূপালির সামনে বসলো।
–কে ফোন করেছিলো বৌদি? রূপালি জানতে চাইলো।
–প্রিয়ন্তির বাবা। দুপুরে বাসায় খেতে আসবে, সে জন্য ফোন করেছিল।
মধুমিতার অগোচরে মুখে ভেংচি কাটলো রূপালি।
–দুপুরে বাসায় খেতে আসলে আবার ফোন করতে হয় নাকি? নিজের বাসায় আসবে, খেয়ে যাবে। বললো রূপালি।
–না, মানে প্রায়ই বাসায় আসে না। যেদিন আসে সেদিন, আগে ফোন করে। না এলে বলে তোমরা খেয়ে নাও। ফোন না করলে তো বুঝতে পারি না আসবে কী আসবে না।
–পুরুষ মানুষ। দুপুরে বাসায় খাবে না এটা কেমন কথা? সবাই বাসায় খাবে আর ঘরের কর্তা বাইরে খাবে এটা ভালো দেখায়?
বিব্রতবোধ করছে মধুমিতা। রূপালি বৌদি মনে হয় স্বামীকে নিয়ে কটাক্ষ করছে। স্বামীও তো বাঙালি।
–না, মানে গাড়ি নিয়ে কখন কোথায় থাকে তার কী ঠিক আছে? দেখা গেল দুপুর গড়িয়ে গেছে, তিনি বাসা থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরে। তখন কী করবে? যা পায় খেয়ে নেয়। সন্ধ্যায় বাসায় আসে, রাতে সবাই একত্রে খায়।
–যা-ই বলুন বৌদি। পুরুষ মানুষকে মুঠোর মধ্যে রাখবেন। একবার যদি মুঠোর বাইরে চলে যায় তাহলে খবর খারাপ আছে। দেখেন না আমি, যদি বলি বসো, বসবে। যদি বলি দাঁড়াও, দাঁড়াবে।
–প্রিয়ন্তির বাবা সে রকম মানুষই না। আমি তো চিনি তাকে। একজন দায়িত্বশীল লোক সে।

মধুমিতার মুখে তার স্বামীর প্রশংসা যেন সহ্য হচ্ছে না রূপালির। কাল আসতে আসতে আজই স্বামীর প্রশংসা? স্বামী কী তোমার একাই আছে নাকি অন্য মানুষেরও আছে? কারো স্বামীই কম দায়িত্বশীল নয়। মনে মনে বললো রূপালি।

–সকলেই দায়িত্বশীল। এই দেখেন না ওর বাবা, যদি বাইরে একটা কলা খাবে তো তার অর্ধেক আমার জন্য নিয়ে আসবে। আমাকে ছাড়া সে কিছু খাবেই না। আমি যত বলি, এসবের দরকার কী? সে বলবে, তোমাকে ছাড়া কোনো কিছু আমার মুখে উঠে না। বলেন তো, পাগল না একটা? রূপালি বললো।

–পাগল কিনা কী করে বলবো বৌদি? আমি তো ওর বাবাকে ভালো করে এখনো দেখিনি। দেখলে বলতে পারতাম। আমি পাগল দেখলে চিনতে পারি। খুব জোর দিয়ে বললো মধুমিতা যেন সে পাগলের ডাক্তার।

প্রসঙ্গ ঘোরাতে চেষ্টা করলো রূপালি। স্বামীকে নিয়ে কচলাকচলি হালে পানি পাচ্ছে না। প্রথমেই মধুমিতা তার স্বামীকে দায়িত্ববান স্বামী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে ফেলেছে।

–রাসেলের মার কথা শুনবেন? মহিলা একটা। অবশ্য আমার সাথে খুব ভালো সম্পর্ক। প্রথম আমরা একই বিল্ডিংয়ে ভাড়া থাকতাম। আমাদের বাসায় আসতো, আমরা যেতাম। খুব ভালো সম্পর্ক ছিল। পরে তো আমরা বাসা বদল করলাম। এখনো ভালো সম্পর্ক আছে। রূপালি বললো।

–বলেন। সবার কথাই শোনা দরকার। আগে-পরে তো এখানেই থাকবো। মধুমিতা যেন রূপালির প্রতি কিছুটা অমনোযোগী হয়ে পড়েছে। স্বামীর আসার সময় হয়ে গেছে। সে এসে যদি রূপালিকে দেখে আবার কী মনে করে কে জানে।

–শোনেন তাহলে,কারো সাথে যদি ঝগড়া-ঝাটি বাঁধানোর দরকার হয় তাহলে রাসেলের মার সাহায্য নিতে পারেন। বিবিসি ফেল তার কাছে। এখানে সব বাঙালি পরিবারের খবর পাবেন তার কাছে। তার কানে কোনো কথা গেল তো রাষ্ট্র হয়ে যাবে। যখন ফোন করবেন তখনই ব্যস্ত পাবেন। কারো না কারো সাথে কথা বলেই যাচ্ছে, বলেই যাচ্ছে। আপনি শুনলেন কী শুনলেন না, পছন্দ করলেন কী করলেন না সে দিকে খেয়ালই করবে না। আপনাকে তার জ্ঞান দিয়েই যাবে। তার টেলিফোন নম্বর আছে আপনার কাছে?

মাথা নেড়ে মধুমিতা না বললো। মনে মনে বললো, এমন লোকের নাম্বার না থাকলেও চলবে।

–আমার কাছে আছে। লেখেন ২১৩-৩৮৪...।

অনিচ্ছাসত্তেও মধুমিতা রাসেলের মার টেলিফোন নম্বার লিখলো।

দরজায় কলিং বের বেজে উঠলো। মধুমিতা দরজা খুলে দিলো। জয়দেব এসেছে।

–আরো বৌদি যে কেমন আছেন? অনেক দিন আপনাদের দেখা সাক্ষাৎ নেই।

–আমাদের দেখা সাক্ষাৎ নাই কে বললো? বৌ আসার পর তো আমাদের কথা ভুলেই গেছেন। আপনারা তো যাবেন না, আমরাই আসি। জবাব দিলো রূপালি।

–জানেনই আমার কাজের ধরণটা কী। বারো ঘণ্টা কাজ করার পর আর একটুও সময় পাই না। এই, বৌদিকে চা নাস্তা দিয়েছো? মধুমিতার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললো জয়দেব।

–দিয়েছে, দিয়েছে। কত কিছু খেলাম এতক্ষণ। আপ্যায়নের বেলায় বৌদির তুলনা হয় না। একটার পর একটা দিয়েই যাচ্ছে, আমিও খেয়েই যাচ্ছি। আজকে তাহলে আমি আসি বৌদি। সবাইকে নিয়ে আমাদের বাসায় যাবেন কিন্তু তা না হলে আমরা আর আসবো না।

–যাবেন কেন? দুপুরে আমাদের বাসায় খাওয়া-দাওয়া করেন। বসেন, বসেন, জয়দেব হাত দিয়ে রূপালিকে বসতে ইশারা করলো।

–না, না, আজকে আর বসবো না দাদা। অনেকক্ষণ হয় এসেছি। ওর বাবা ফোন করে ঘরে না পেলে চিন্তা করবে। সুব্রতকে স্নান করাবো, খাওয়াবো তারপর ঘুম পাড়াবো। আপনারা তো যান না তাই নিমন্ত্রণ দিতে এলাম। বৌদির সাথে অনেকক্ষণ গল্প করলাম। উঠে দাঁড়ালো রূপালি। ছেলেকে কোলে নিলো। মধুমিতা পাশে দাঁড়িয়ে আছে। সে কোনো কথা বলছে না।

–এই দুপুর বেলা একজনের বাসা থেকে না খেয়ে যাবেন, এটা কেমন দেখা যায় বৌদি? জয়দেব বিনয়ের সাথে বললো।

–না খেয়ে কোথায়? অনেক কিছু খেলাম তো। আপনারা সবাই একদিন আসুন। তারপর আমরা আসবো। বলেই দরজার কাছে চলে গেলো রূপালি। মধুমিতা তাকে দরজা খুলতে সাহায্য করলো।

জয়দেব স্নান করতে বাথরুমে চলে গেলে মধুমিতা তার জন্য খাবার প্রস্তুত করে ডাইনিং টেবিলের পাশে চেয়ার ধরে দাঁড়িয়ে আছে।

জয়দেব এসে খেতে বসলো। ছেলেমেয়েদের এখনো স্কুল থেকে আসার সময় হয়নি।

–রূপালি বৌদিকে তুমি কী আগে থেকেই চিনতে? মধুমিতা বললো।

–চিনবো না? খুব চিনতাম। কত যাওয়া আসা করেছি আগে। মুখে ভাত দিয়ে বললো জয়দেব।

–সেটা তোমাদের কথার ধরন দেখেই বুঝতে পেরেছি।

–কথার ধরন মানে? মুখ থেকে মাছের কাঁটা ফেলতে ফেলতে বললো জয়দেব।

–এমন করে কথা বললে যেন কতকালের সত্যি সত্যি বৌদি। কোনো মহিলার সাথে আমার সামনে এমন করে কথা বলবে না। আমার গা জ্বালা করে।

–তুমি কিন্তু আবার আমাকে অভিযুক্ত করছো। একজন লোক ঘরে এসেছে, তার সাথে কী আমি খারাপ করে কথা বলতে পারি? আচার-আচরণও তোমাকে আমার শেখাতে হবে? তুমি একটা নীচু মনের মানুষ। আমি যদি খোলা মনে তার সাথে কথা না বলতাম তাহলেও কিন্তু তুমি আমাকে অভিযুক্ত করতে কেন তার সাথে কথা বলিনি। তুমি একজন জটিল চরিত্রের মহিলা। খাবো না তোমার ভাত, উঠলাম। স্বামীর ডান হাতটা খপ করে ধরলো মধুমিতা।

–খাও। এত রাগ কেন তোমার? একটা কথাও বলা যায় না।

–তোমার কথা শুনলেই আমার গা জ্বালা শুরু হয়। তুমি ঐ মহিলার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক আছে এমন এ্যাংগেলে কথা বলেছে। আমার দুপুরটাকে মাটি করাই তোমার উদ্দেশ্য। ঘরে মেহমান আছে বলতে পারতে, আমি আসতাম না।

–কেন, ঘরে স্ত্রী থাকতে বাইরে খাবে কেন? আমি মরে গেছি? পুরুষ মানুষকে কী বিশ্বাস আছে?

–তুমি আবার কথার বাঁক ঘুরাচ্ছো? পুরুষ মানুষকে বিশ্বাস নেই, পুরুষ মানুষরা কী তোমাকে ইয়ে করেছে নাকি? হাত তুলে বসে আছে জয়দেব।

–খাও তো। পুরুষ মানুষরা আমাকে কী করবে? রূপালি বৌদি বললো পুরুষ মানুষকে বিশ্বাস করতে নেই, তাই বললাম। তাতেই সাহেবের এত রাগ। পুরুষ মানুষের এত রাগ ভালো না। খাও। মধুমিতা স্বামীর হাত চেপে ধরলো ভাতের থালায়।

জয়দেব খেতে শুরু করলো। তাহলে এতক্ষণ স্বামীর মুন্ডুপাত হচ্ছিল? আর আমি এসে পরাতেই মুন্ডুপাত বন্ধ হয়ে গেল? অন্য একজনের স্ত্রী বললো স্বামীকে বিশ্বাস করতে নেই আর তুমি অমনি তা এক্সপেরিমেন্ট করতে শুরু করলা? তুমি তো অন্য লোকের সাথে চলতে পারবা না। কেউ যদি তামাশা করেও তোমার কানে পৌঁছাতে পারে যে জয়দেবকে দেখলাম দু'জন মহিলা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তুমি তো অমনি বিশ্বাস করে বসবে। তুমি ঐ মহিলাকে বলতে পারলে না যে আপনি কী আপনার স্বামীকে বিশ্বাস করছেন না? আমি বুঝতে পারছি না মহিলাগুলো এমন কেন? তাদের পেটে আস্ত একটা মানুষ থাকে অথচ একটা কথা থাকে না। কোন জটিল সমাজে বাস করছি আমরা? তুমি কোনো মহিলার সাথে কথা বলবা না, কাউকে ফোন করবা না। ঠিক আছে?

–বললেই হলো? আমি সারাদিন মুখে স্কচট্যাপ দিয়ে বসে থাকবো? আসলে আমাকে নিয়ে তুমি সুখী না। সে জন্যই তোমার মনে এত এত জ্বালা। আমি না হয় একটা কথা বলেই ফেলেছি, তাই বলে এত রাগ করতে হবে?

–তুমি তো কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দিতে খুবই পারদর্শী। এখানে আসার আগে ভুলেও বুঝতে পারিনি তুমি এত জটিল মহিলা। যদি বুঝতাম... তাহলে?

–তাহলে? তাহলে আমাকে আনতে না, এই তো? এনে যদি ভুল করে থাকো তাহলে এখন পাঠিয়ে দাও। তোমার ভুল শোধরানো হোক। আমরা চলে যাই।

–তোমার কপালে হয়তো তা-ই আছে। যাকে যেখানে মানায়।

–তুমি কিন্তু আমাকে বড় ধরনের অবজ্ঞা করছো। তুমি বলতে চাও আমাকে এখানে মানায় না? আমি আমেরিকায় থাকার যোগ্য না? একমাত্র তুমি থাকার যোগ্য?

–আর যদি দুপুরে বাসায় আসি। বিকেলে বাসায় আসার সময়ও রাতের খাবার খেয়ে আসবো। অসহ্য মহিলা একটা। আমার জীবনটাকে একদম অতিষ্ঠ করে তুলেছে। কথায় কথায় আমার পিছনে লেগে থাকে। কাজ করে খেতে এসেছি, আবার কাজে চলে যাব। এই যে কচর কচর শুরু করলো। আসলে তোমার আরো পড়ালেখা করা উচিত ছিল। এত অল্প জ্ঞান নিয়ে আমার স্ত্রী হওয়া তোমার ঠিক হয়নি। যাও, আমার সামনে থেকে।

–এখন কী আবার দেশে গিয়ে প্রাইমারি স্কুলে ভর্তি হবো? হি হি করে হাসলো মধুমিতা।

–তুমি আমার সামনে থেকে যাও। তোমার মুখ আমি দেখতে চাই না।

মধুমিতা চেয়ার থেকে উঠে জয়দেবের পিছনে গা ঘেঁষে দাঁড়ালো। আলতো করে স্বামীর মাথায় হাত বুলাতে লাগলো।

–যাওনি তুমি? আমি কী বলেছি আমার মাথায় হাত বোলাতে?

–তোমার সামনে থেকে যেতে বলেছো, পিছনে এসেছি। আমার মুখ দেখতে চাও না, ভালো কথা। পিছনের দিকে তো আমার মুখ দেখতে পাবে না। মাথায় তো আর চোখ নেই। অলস দাঁড়িয়ে আছি তাই একটু...। না বললে দিবো না। এমন স্ত্রী পাবে আর একটাও? হো হো করে হাসলো জয়দেব। মুখ থেকে ভাত অনেক দুরে ছিটকে পড়লো। জল খেল সে। মধুমিতা স্বামীর পিঠে হাত বুলিয়ে দিলো।

–সামনে আসো। শাসনের সুরে বললো জয়দেব।

–সামনে গেলে তো আমাকে দেখতে পাবা। আবার বলবে তোমার গা জ্বলছে। জটিল মহিলা একটা। দরকার কী কারো সামনে যাওয়া? জটিলতা নিয়ে পিছনেই থাকি।

–সামনে আসবা কিনা। আরো কড়া শাসনের সুরে বললো জয়দেব।

–কারো ধমকে আমি ভয় পাই না। এটা আমেরিকা। এখানে কারো ধমকে কেউ ভয় পায় না।

–আমেরিকা যে এসে গেছ সে কথা বুঝে গেছ তাহলে? তাই তো বলি এত চটাং চটাং কেন। আমার তো খেয়ালই নেই যে মধুমিতা আমেরিকা এসে গেছে।

–আমাকে নিয়া তামাশা করবা না, বুঝলা। আমি কোনো তামাশার লোক না।

–পিঁপিলিকার পাখা গজায় মরিবার তরে, পড়নি ছোটবেলা? পাখা ভেঙ্গে দিলেই সব শেষ। আর তিড়িংবিড়িং করতে পারবা না। দু'দিনের সাধু ভাতকে বলে প্রসাদ। আসতে না আসতেই আমেরিকা চিনে গেছে।

–চিনবো না? তোমার মতো বোকা নাকি আমি? তুমি তো একটা শিক্ষিত বোকা। ফোন করে যখন জিজ্ঞাসা করতাম কী করো, বলতে পাইলটগিরি করি। এখন এসে তো দেখলাম কী কাজ করো।

–গাড়ি চালানো কী কোনো কাজ না?

–কাজ তো বটেই। গাড়ি চালানো আর বিমান চালানো? রূপালি বৌদি যে বললো তার স্বামী সরকারি চাকরি করে, তারা তো তোমার অনেক পরে এসেছে। তারা তোমার পরে এসে সরকারি চাকরি করতে পারলে তুমি তাদের আগে এসে সরকারি চাকরি করতে পারলে না কেন? তোমার কী বিদ্যার জোর কম?

–রূপালি বৌদি বললো তার স্বামী সরকারি চাকরি করে? তাচ্ছিল্যের সাথে প্রশ্ন করলো জয়দেব।

–বললো তো। না বললে আমি বললাম কী করে? আমি কী তাকে ভালো করে চিনি? দৃঢ়তার সাথে জবাব দিলো মধুমিতা।

–বলেছে তো? দেখ কিন্তু। পরে তুমি আবার ফেঁসে না যাও। এবারো তাচ্ছিল্য নিয়ে বললো জয়দেব।

–আর কী বললো রূপালি বৌদি? এবার একটু সিরিয়াস হলো জয়দেব।

–সব কথা তোমাকে বলতে হবে নাকি?

–থাক, সব কথা আমাকে বলার দরকার নেই। দেয়াল ঘড়ির দিকে তাকালো জয়দেব। দুটো বাজে। স্ত্রীকে আবার প্রশ্ন করলো–ওদের স্কুল থেকে আসতে আর কতক্ষণ বাকি?

–কেন? আরো দেড় ঘণ্টা বাকি।

খানিকক্ষণ কী যেন ভাবলো জয়দেব। লাগবে তো ১৫/২০ মিনিট। যদিও কাজটা ঠিক নয় তবুও কিছু কিছু প্রমাণ করা দরকার।

–একা একা কী বলছো? যা বলবা পরিস্কার করে বলবা যেন বুঝতে পারি।

–কাপড়-চোপড় পরো। আমার সাথে রূপালি বৌদির স্বামীর সরকারি অফিসটা একটু দেখে আসবা। বেচারা এত কষ্ট করে সরকারি চাকুরিটা করে আমরা যদি একটু না দেখি। তবে একটা শর্ত আছে। শর্তের বাইরে যেতে পারবে না কিন্তু। তোমার তো বকবকানি রোগ আছে।

–শর্ত কী আবার? সন্দেহের চোখে মধুমিতা জয়দেবের চোখের দিকে তাকালো।

– শর্ত হলো–ইহকাল, পরকাল কোনোকালেই এ-ব্যাপারে আর কোনো প্রশ্ন করতে পারবা না। শুধু দেখবা। ভুলক্রমেও এ-ব্যাপারে রূপালি বৌদির সাথে কখনো আলাপ করবা না। শর্তে রাজি?

কীসের যেন একটা গন্ধ পেল মধুমিতা। কোথাও বড় ধরনের একটা গরল আছে কিন্তু সে বুঝতে পারছে না সেটা কী।

–ওরা স্কুল থেকে আসবে, যদি দেরি হয়ে যায়? আমি বাসায় আসবো কীভাবে?

–লাগবে তো ১৫/২০ মিনিট। তোমাকে কী সে সরকারি অফিসে রেখে আসবো নাকি? বাসার সামনে নামিয়ে দিয়ে যাব। শর্ত মনে আছে? কোনো প্রশ্ন করবা না। তুমি দেখে যা বোঝার বোঝবা।

–আচ্ছা, ঠিক আছে। জবাব দিলো মধুমিতা।

ভাত খাওয়া শেষ করে জয়দেব কয়েক মিনিট বিছানায় গড়াগড়ি দিলো। এ ফাঁকে মধুমিতা রেডি হলো।

জয়দেব মধুমিতাকে একটি গ্যাস স্টেশনে নিয়ে গেল। ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করে গাড়িতে গ্যাস ভরলো। এরপর মধুমিতাকে নিয়ে বাসার দিকে রওনা দিলো।

–কিছুই বুঝলাম না। আমি কিন্তু কোনো প্রশ্ন করিনি, কিছুই যে বুঝলাম না সেটা প্রকাশ করেছি মাত্র।

–কিছুই বুঝলা না? বুথের মধ্যে একজন লোক দেখছো?

–দেখলাম তো। বাঙালি বলেই মনেই হলো।

–এই তো সব বুঝে গেছ। উনিই রূপালি বৌদির স্বামী, সুব্রতের বাবা মি. গঙ্গাচরণ। আমেরিকার সরকারি চাকুরে।

–ওমা, বৌদি যে বললো তার স্বামী সরকারি চাকরি করে, ভালো বেতন পায়, অনেক সুযোগ-সুবিধা। সামনের বছর তারা বাড়ি কিনবে। নিজের চোখেই তো দেখলাম এ যে গ্যাস স্টেশনের ক্যাশিয়ার। মানুষ এমন বাড়িয়ে বলে? নিজেই যেন বিশ্বাস করতে পারছে না মধুমিতা। মাত্র দু'তিন ঘণ্টা আগে শোনা কথা।

–এই ব্যাপারে রূপালি বৌদির সাথে যদি কখনো কোনোদিন কোনো কথা বলছো তো আমি তোমার মুখ সেলাই করে দিবো।

–তুমি সেলাই করবা কী? আমি তো নিজেই বোকা হয়ে গেছি। মানুষ এমন বাড়িয়ে কথা বলে কী মজা পায়? গ্যাস স্টেশনের কাজ তো কোনো অসম্মানের কাজ নয়। পেলে তো আমিও করবো। আমাকে বোকা বানানোর জন্য তার খেলা? এখন কে বোকা হলো? বললো মধুমিতা।

কথায়, কথায় জয়দেবের গাড়ি বাসার সামনে চলে এলো। গাড়ি থামালো সে। দরজা খুলে দিলে মধুমিতা নেমে দাঁড়ালো। বাসার পথে হাঁটতে উদ্যত হলো সে।

–এমন একটা আশ্চর্য জিনিস দেখিয়ে আনলাম কিছু না দিয়েই চলে যাবা? এমন অকৃতজ্ঞ কী কোনো মানুষ হয়? জয়দেব বললো স্ত্রীকে।

–ফুরিয়ে তো যাচ্ছে না। বাসায় আসো, রাতে সুদসহ দিয়ে দিবো। বলেই মধুমিতা চলে গেল।

–স্ত্রীর পেছন দিকে একবার তাকিয়ে জয়দেব গাড়ি নিয়ে চলে গেল।

বেলা এখনো তিনটাও বাজেনি। বিছানায় গা এলিয়া দিলো মধুমিতা। স্বামীর কথা মনে পড়লো তার। একটু বিশ্রাম তো নিয়ে যেতে পারতো। একদিন না হয় কিছু রোজগার কম হতো। ঐ রূপালি বৌদির জন্যই সব এলোমেলো হয়ে গেল। স্বামী চাকরি করে গ্যাস স্টেশনে আর সে বলে গেল সরকারি চাকরি করে। নতুন পেয়ে আমাকে বোকা বানিয়ে গেল। এখন কিছুই বলবো না। নিজের চোখেই তো দেখে এলাম। ইস, কী সোহাগ স্বামী একটা কলা খেলেও বোধহয় তার জন্য অর্ধেক নিয়ে আসে। স্বামী যদি সিগারেট খায় তাহলেও কী স্ত্রীর জন্য অর্ধেক নিয়ে আসে? ঢং । ঢং আর কাকে বলে? স্বামীকে বিশ্বাস করতে নেই। স্বামীকে বিশ্বাস না করে কী তোমাকে বিশ্বাস করবো? কী একটা গপ্পো ছেড়ে গেল আমাকে। এখন যদি ফোন করে বলি যে আমি নিজের চোখে দেখে এসেছি তোমার স্বামীকে তেল বিক্রি করতে, শুধু দেখিনি আমার স্বামী তোমার স্বামীর গ্যাস স্টেশন থেকে তেল

কিনেছে তাহলে তোমার মুখটা থাকে কোথায়? আমাকে তো চিনলে না রুপালি বৌদি, আমি সেকেন্ড ডিভিশনে এসএসসি পাশ করে এসেছি। ফাজিল মহিলা একটা। পারলে কিছু সুপরামর্শ দে, না পারলে চুপ থাক। স্বামীর মিথ্যা গুণকীর্তন। এখন গেল স্বামীর প্রশংসা? আমার স্বামীও তো তোমার স্বামীকে দেখে এসেছে। আমার সাথে চাপাবাজি? দেখবা একদিন আমার মুখটা কেমন চলে। কখন যে চোখজুড়ে ঘুম নেমে এলো মধুমিতা বলতে পারবে না।

দরজায় কলিং বেল বাজছে। হুড়মুড় করে লাফ দিয়ে উঠলো মধুমিতা। ঘড়ির দিকে তাকালো সে। সাড়ে তিনটার বেশি বাজে। দ্রুত দরজার কাছে গেল সে। লুকিং গস্নাস দিয়ে তাকিয়ে দেখলো প্রিয়ন্তি দাঁড়িয়ে আছে। দ্রুত দরজা খুললো। দ্রুত বেগে ছেলেমেয়েরা ঘরে ঢুকলো।

–অনেকক্ষণ হয় এসেছিস মা? মধুমিতা বললো মেয়েকে।

–না, অনেকক্ষণ না। মাত্র এলাম। বলো যে এখনো আসিইনি। স্কুলের পথে আছি। কিরে জয়ন্ত, পড়ন্ত আমরা কী বাসায় এসেছি?

–মায়ের সাথে কেউ এভাবে কথা বলে প্রিয়ন্তি? বিছানায় গা-টা একটু এলিয়ে দিলাম, কখন যে ঘুমে ধরলো টেরই পেলাম না। যা স্নান করে আয়। মরার ঘুম কাকে বলে।

–সুখে থাকলে তো ঘুম আসবেই। রাখো, আজ বাবা বাসায় আসুক। এত আরামের ঘুম কেন? এ সময় তোমার না বাসস্টপে থাকার কথা?

–বললাম তো একটু ঘুমে ধরেছিল। তুই ঘুমাস না? ছুটির দিনে তোর তো ঘুম ভাঙেই না।

মধুমিতা এগিয়ে গিয়ে জয়ন্ত ও পড়ন্তের স্কুলের ড্রেস খুলে দিলো। স্কুল ব্যাগ গুছিয়ে রাখলো। সবাই স্নান করে এলে খাবার দিলো।

–হ্যাঁরে প্রিয়ন্তি, মনে কর আমি যদি চাকরিতে যাই আর এ সময় বাসায় না থাকি তুই কী ভাইদের নিয়ে খাওয়া-দাওয়া করতে পারবি না?

–বাবা না তোমাকে চাকরি করতে নিষেধ করে? তোমার চাকরির দরকার কী?

–তোর বাবা যা বলে তা-ই হবে নাকি? চাকরি আমার একটা দরকার। আমার টাকার দরকার।

–টাকা যে তোমার কী কারণে দরকার সেটা আমি জানি। ক্ষেপে গেল মধুমিতা। ইচ্ছে করে মেয়ের গালে একটা চড় বসিয়ে দিতে। মুখে মুখে কথা।

–তুই কী জানিস আমার কীসে টাকা লাগবে? বজ্জাত মেয়ে।

–বজ্জাত, বজ্জাত করবা না মা। সেদিন তোমার বাবার সাথে ফোনে কথা বলোনি? এখনো চাকরি পাই নাই, চাকরি পাইলে টাকা পাঠাবো। বলোনি? বলো, বলোনি তুমি? আমার কী কান নেই?

–কত বড় বেয়াদব হয়েছে, বড়দের সম্মান করে কথা বলে না। বলে কিনা আমার বাবার!

–তোমার বাবা না-তো কী। সব সময়ই তো কেবল টাকা আর টাকা। আমার বাবা কেন তোমার বাবাকে দেখতে পারে না? অ্যাঁ।

–তোর গালে আমি একটা চড় বসিয়ে দেবো প্রিয়ন্তি। আমার পেটের সন্তান, আমেরিকা আসতে না আসতেই আমার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরে?

–থাপ্পড় মেরেই দেখো না। তোমার বারোটা বাজবে। এটা আমেরিকা বুঝলে? বাংলাদেশ নয়। পুলিশ এসে তোমাকে ধরে নিয়ে যাবে।

–দেখেছো, দেখেছো কান্ড? আমাকে পুলিশের ভয় দেখায়? এন্দুর? তোর বাবাকে আমি ফোন করবো? মেয়ে ভালো বেয়াদপ হয়ে গেছে।

–করবা? কর। আমার বাবা তোমার বাবার মতো নয়। নিচের দিকে তাকিয়ে বললো প্রিয়ন্তি।

–দেখেছো মেয়ে বলে কী? এখনই এমন মুখে মুখে তর্ক করে? কথায় কথায় ওর বাপের মতো আমার বাবা-মার দোষ ধরে। মধুমিতা পারলে মেয়েকে গালে চড় মারে আরকি।

–তোমাকে না বাবা বলেছে অকারণে তোমার বাবা-মাকে এখানে টেনে না আনার জন্য? তুমি বারবার তাদেরকে নিয়ে টানাটানি করছো কেন? নিয়া আসো না তাদেরকে।

–এত বেড়ে গেছিস? আসুক তোর বাবা আজকে। বলবো ওকে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দাও।

–তোমার বাবা কী আমাকে আমেরিকা পাঠিয়েছে যে তোমার কথায় বাবা তার মেয়েকে পাঠিয়ে দেবে? তোমাকে পাঠিয়ে দিবো। আমিও বাবাকে বলবো সারাদিন ফোন করে আর কেবল টাকা টাকা করে।

দ্রুত শান্ত হয়ে গেল মধুমিতা। গৃহশত্রু বিভীষণ। বাপের কাছে সব কথা বলে দিলেও দিতে পারে। ফোনে কথা বললে সব কথা শোনে। আজকালকার ছেলেমেয়েগুলো হয়েছে এক নম্বরের বদমাশ। বাপ-মা কী বলে সেগুলো শোনে। চাকরি করার আগেই যদি সব ফাঁস হয়ে যায় তো মহা মুশকিল। মেয়ের সামনে আর ফোন করা যাবে না। পরম স্নেহে ছেলেদের মাথায় হাত বুলিয়ে দিলো মধুমিতা।

–পারবি না জয়ন্ত দিদির সাথে ২/৪ ঘণ্টা থাকতে? মা তো চলে আসবোই। তোরা খাওয়া-দাওয়া করে হোম ওয়ার্ক করতে করতে দেখবি মা চলে এসেছি।

জয়ন্ত মাথা কাৎ করে জবাব দিলো যে সে পারবে।

–মা প্রিয়ন্তি, এসব বিষয় নিয়ে বাবাকে বলার দরকার নেই। আমি যদি দু'টাকা আয় করতে পারি সেটা তোমাদের জন্যই। এদেশে কেউ বসে বসে খায় না। তোমার বাবা আমার কাজের ব্যাপারে না বললে তোমরা আমার পক্ষে বলবা। বলবা যে, মা কাজে থাকলে আমরা একা থাকতে পারবো। তাছাড়া তোমার বাবা তো সন্ধ্যার আগেই চলে আসে। আমি যে প্রতিদিন কাজ করবো তা তো নয়। মাঝে মাঝে। যা বললাম ঠিক আছে?

তিনজনই মাথা কাৎ করে মায়ের পক্ষে সায় দিলো।

এবার মনে মনে মধুমিতা কিছুটা ভরসা পেল। আমরা চারজন আর তুমি একা। আমেরিকা এসে কাজ করবো না এর কোনো মানে হয়? নাকের ডগার কাছে ডলার উড়ে অথচ ধরবো না। শুধু চেয়ে থাকবো, তা তো হয় না। কিছু ধরবো, কিছু ছাড়বো। পারলে ঠেকাও তুমি।

৪

সকাল আটটা। ছেলেমেয়েরা সব স্কুলে চলে গেছে। জয়দেব ঘরে অলস সময় কাটাচ্ছে। গতকাল মেকানিকের কাছে গাড়ি দিয়েছে কাজ করানোর জন্য। মেকানিক বলেছে এই দুপুরের মধ্যে সারতে পারলে ফোন করবে। না সারতে পারলে বিকেল হয়ে যাবে সারতে সারতে।

মধুমিতা স্কুলে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছে। প্যান্ট পরেছে সে। শার্ট গায়ে দিয়েছে। শার্টের বোতাম উপর থেকে দুটো খোলা রেখেছে। শার্ট ইন করেছে সে। শার্টের পকেটে মার্লবরো সিগারেট রেখেছে এক প্যাকেট।

মধুমিতার গতিবিধি তেমন একটা লক্ষ করেনি জয়দেব। সে শোবার ঘরে আধা শোয়া অবস্থায় পত্রিকা পড়ছে।

–মি. ডেব, সকালের নাস্তা বানিয়ে খেয়ে নিয়ো। আমি স্কুলে গেলাম। ঘরের মধ্যে মধুমিতা ছাড়া আর কেউ নেই। ডাইনিং রুম থেকে এমন একটি কণ্ঠস্বর ভেসে আসতে পারে জয়দেব তা কল্পনাও করতে পারেনি। খাটের উপর পত্রিকাটি ভাঁজ করে রেখে সে ডাইনিং রুমে এসে দাঁড়াল। তার সামনে দিয়ে মধুমিতা বের হয়ে যাচ্ছিল। জয়দেব দরজা আগলে দাঁড়াল।

–এসব কী হচ্ছে? কর্কশ গলায় বললো জয়দেব।

–কোন সব? সরে দাঁড়াও। আমার টাইম হয়ে যাচ্ছে। মধুমিতা গায়ে ঠেলা দিয়ে জয়দেবকে সরাতে চাইলো।

–শার্ট-প্যান্ট পরেছো তুমি? পকেটে সিগারেট? নিজের চোখকে যেন বিশ্বাস করতে পারছে না জয়দেব। এ-কাকে দেখছে? মধুমিতা না অন্য কেউ?

–দেখতেই তো পাচ্ছ। আন্ নেসেসারি প্রশ্ন করছো কেন?

–কার অনুমতি নিয়ে শার্ট-প্যান্ট পরেছো? সিগারেট খাওয়াও শুরু করেছো?

–শার্ট-প্যান্ট পড়তে কারো অনুমতি লাগে না। সময় হয়ে গেছে আমার, সরে দাঁড়াও। গড়াব.

–এত অধঃপতন হয়েছে তোমার? তুমি শার্ট-প্যান্ট পরতে শুরু করেছো? পকেটে সিগারেট রাখছো? আর আমি এসবের কিছু জানি না?

–জানলে কী করতে তুমি? যেখানে যখন সেটা মানায়। সবাই শার্ট-প্যান্ট পরেই স্কুলে যায়। ক্ষেতের মতো শাড়ি পরে ঘোমটা দিয়ে স্কুলে যাব নাকি। বললাম না যে আমার টাইম হয়ে গেছে? সরে দাঁড়াও। গড়াব.

–তোমার আর স্কুলে যাওয়া লাগবে না। স্কুল বন্ধ। বেয়াদপ মহিলা। লজ্জা–শরমের মাথা খেয়েছে। এন্দুর? আমি বাসায় থাকি না বলে যা খুশি তাই করে যাচ্ছে।

জয়দেবকে হাত দিয়ে ঠেলা দিয়ে সারিয়ে মধুমিতা দরজা খুলে স্কুলে যাবার চেষ্টা করলো। জয়দেব দরজা কোনোভাবেই খুলতে দিলো না। সে মধুমিতাকে ধাক্কা দিলো। মধুমিতা নিজেকে সামলে রাখতে পারলো না। সে চিৎ হয়ে ফ্লোরে পড়ে গেল এবং তার বক্ষদেশ নগ্ন হয়ে গেল। পকেট থেকে মালব্রো সিগারেটের প্যাকেট সিটকে ফ্লোরে পড়লো।

ভেউ ভেউ করে কাঁদতে আরম্ভ করলো মধুমিতা। উঠে দাঁড়ালো সে। সিগারেটের প্যাকেট আবার পকেটে ঢোকালো মধুমিতা। শব্দ করে কাঁদছে সে। জয়দেব এখনো দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

–ডাকবো পুলিশ? মধুমিতা ফোনের কাছে গেল। রিসিভার হাতে নিলো। জয়দেব দ্রুত মধুমিতার হাত থেকে রিসিভার কেড়ে নিলো।

–একটা টু শব্দ করেছো তো আজ তোমার একদিন কী আমার একদিন। বেশরম মহিলা, বেআক্কেল কোথাকার তিন সন্তানের জননী হয়ে শার্ট–প্যান্ট পরে। সিগারেট রাখে পকেটে। শার্টের বোতাম খোলা রাখে। কম আক্কেল মহিলা। উত্তেজনায় গা কাঁপছে জয়দেবের।

–এখানে তো সবাই শার্ট–প্যান্ট পরে। অন্য মহিলারা তো আরো কত কম কাপড়ের ড্রেস পড়ে। তাদের কোনো দোষ হয় না, যত দোষ আমার। মধুমিতার নাকের জল–চোখের জল একত্র হয়ে গেছে।

–অন্যরা যা করে তুমিও তাই করবে নাকি? ছোটলোকের বাচ্চা কোথাকার, বেয়াদব।

–তুমি বেয়াদব। সরে দাঁড়াও স্কুলে আমার পরীক্ষা আছে আজ। মধুমিতা আবারো জয়দেবকে সরিয়ে বের হতে চেষ্টা করলো।

জয়দেব এবার চেপে ধরে মধুমিতাকে ফ্লোরে বসিয়ে দিলো। উত্তেজিত কণ্ঠে বললো সে–স্কুলে যাওয়া বন্ধ বললাম যে কানে গেল না? আজ থেকে ঘর হতে বের হওয়াও বন্ধ। বন্দি করা হলো তোমাকে। মদ খাওয়াও শুরু করেছো নাকি?

–সিগারেট আমি খাই নাকি? খেলে রাতে গন্ধ পেতে না মুখ থেকে? বন্ধুরা বলে–জোলি ডু ইউ হ্যাভ এ সিগারেট? তখন লজ্জায় পড়তে হয়। সেজন্য পকেটে রাখি। বন্ধুরা চাইলে একটা দু'টা দিই এটাও আমার দোষ? ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে মধুমিতা।

–জোলিটা আবার কে? বিস্ময় নিয়ে প্রশ্ন করলো জয়দেব।

–জানে না মনে হয়, ন্যাকা। বন্ধুরা আমার নাম রেখেছে জোলি।

–সবই তোমার বন্ধুরা করেছে? আর তুমি কিছুই করোনি? অজ পাড়াগাঁ থেকে একটা ভূত ধরে এনেছি হলিউডে। বছর না ঘুরতে সে মধুমিতা নাম পরিবর্তন করে রেখেছে জোলি। মধুমিতা ওরফে জোলি এখন শাড়ির পরিবর্তে প্যান্ট–শার্ট পড়ে। পকেটে সিগারেট রাখে, শার্টের বোতাম খোলা রাখে। আমার ইচ্ছে করে এক থাপ্পড়ে তোমার ত্রিশটা দাঁত ফেলে দিই। এতকিছু যে ঘটলো আমাকে বলোনি কেন? জয়দেব মধুমিতার গায়ের দিকে তেড়ে যায়। থাপ্পড় মারবে বলে হাত উঁচু করে। আবার নিজেকে সংবরণ করে সে।

–তুমি ভূত বলে আমাকেও ভূতের মতো থাকতে হবে? আমেরিকা এসে মানুষ পরিবর্তন হবে না? তা না হলে এখানে আসে কেন? একা একা বলছে মধুমিতা আর কাঁদছে।

–এই তোর পরিবর্তন ছোটলোকের জাত? নির্লজ্জ, বেহায়া, বেশরম। তোর স্কুল বন্ধ, বাইরে যাওয়া বন্ধ। তোর সব বন্ধ। দেখি কোন আইন আমাকে কী করে। একটা ছোটলোককে আমি আমেরিকা নিয়ে এসেছি। তোর মতো ছোটজাতের লোকের জন্য এই শহর নয়। তোকে মানায় বস্তিতে। কপালের রগ ভেসে উঠেছে জয়দেবের। গায়ে যেন তার আগুন জ্বলে যাচ্ছে। তার মধুমিতা কখন এঞ্জেলিনা জোলি হয়ে গেছে সে বলতে পারে না।

–আমার নাম নিয়ে সবাই হাসাহাসি করে। কেউ ডাকে মডু, কেউ ডাকে মিঠা, আমার নিজেরই শরম লাগে। তাই এক বন্ধু ঠিক করলো আমার নাম মডুও নয় মিঠাও নয়, জোলি। আর তাতেই আমার এত দোষ? অন্য মানুষ যে নাম পরিবর্তন করে তাদের দোষ হয় না? যত দোষ কেবল আমার? কান্না একটু কমিয়েছে মধুমিতা।

–বাংলাদেশে হলে তোর গায়ের চামড়া এতক্ষণে আমি তুলে ফেলতাম। ছোটলোকের জাত। বেঁচে গেলি এটা আমেরিকা বলে।

–বাংলাদেশে তো এসবের দরকার হয় না। সেখানে তো কোনো মেয়েমানুষের কাছে কোনো ছেলেমানুষ সিগারেট চায় না। মধুমিতাকে কেউ মডুমিতা ডাকে না। দেশে যারা ঘোমটা দিতো তারাও এখানে শর্টকাট পোশাক পরে। সবকিছু কেবল তুমিই দেখ, আমি দেখি না? আমার চোখ নাই? ঘোমটা কিন্তু প্রথম আমি খুলিনি, তুমি খুলতে বলেছো। আজ এমন অবিচার, ভগবান সহ্য করবে না।

মধুমিতার শেষ কথাটায় প্রচন্ড ঝাঁকুনি দিলো জয়দেবকে। রিখটার স্কেলে ৮ মাত্রায় ভূমিকম্প যেমন অনুভূত হয় অনেকটা তেমন। এয়ারপোর্টে জয়দেব তার স্ত্রীকে মাথার ঘোমটা খুলতে বলেছিল একথা সত্য। শাড়ি পরা ঠিক আছে কিন্তু ঘোমটা দেওয়াটা বোধহয় বেশি বেমানান দেখাচ্ছিল। সে স্ত্রীকে ঘোমটা খুলতে বলেছে মাত্র, তাকে সমস্ত বস্ত্র খুলে ফেলতে বলেনি। তাকে শার্ট-প্যান্ট পরতে বলেনি। শার্টের বোতাম খোলা রাখতে বলেনি। পকেটে মালবরো সিগারেট রাখতে বলেনি। অসভ্য আচরণ শিখতে বলেনি।

তবে কী আমিই আজকের এ অবস্থার জন্য দায়ী? চোখের সামনে যেন ভেসে উঠে তার মা-মাসি-পিসি-বড় বোনের ঘোমটা দেওয়া মুখশ্রী। চোখের সামনে ভেসে উঠে গোটা বাংলাদেশ। গ্রামীণ জনপদ। বোরকাপরা পাড়ার চাচি-খালাদের অবগুণ্ঠন। যাদের কোলে পিঠে সে বড় হয়েছে তাকে দেখলে এখনো তারা মাথায় কাপড় টেনে দেয়। প্রচন্ড ধাক্কা খায় জয়দেব। সবকিছু তার কাছে এলোমেলো হয়ে যায়। এই এক গোয়ারে বৌটা তাকে না জানি কোথা নিয়ে ঠেকায়। এক অন্ধকার ভবিষ্যতের ছায়া দেখে জয়দেব।

রিসিভার তুলে নির্মল বাবুকে ফোন করে জয়দেব। নির্মল বাবু বাসায়ই ছিল। দুপুর দুটো থেকে তার কাজ। এখন সকাল ন'টাও বাজেনি। নির্মল বাবুকে বাসায় থাকতে বলে জয়দেব।

–আমি বাইরে গেলাম। আমি না আসা পর্যন্ত বেডরুমে কান ধরে এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। ঘরে এসে আমি যেন এই শার্ট-প্যান্ট না দেখি এখন থেকে আবার ঘোমটা দিবে। কথা কী কানে গেল?

কাঁদো, কাঁদো গলায় মধুমিতা বলল-স্কুলে কী আর আসলেই যেতে পারবো না? আজ যে একটা পরীক্ষা ছিল।

–বললাম তো না। ঘরে বসে পড়বে অ-তে অজগর, আ-তে আম। ঝাঁঝালো কণ্ঠে বললো জয়দেব।

–ক'কান ধরবো? এককান না দু'কান? যদি খিদা লাগে? বাথরুমে যেতে হয়?

–সে সময় শাস্তি শিথিল থাকবে। খিদা লাগলে খাওয়া যাবে, বাথরুম লাগলে ব্যবহার করা যাবে। কিন্তু শাস্তি এড়াতে অকারণে বাথরুমে বসে থাকা যাবে না। বে-আক্কেল মহিলা। শুধু বাইরে সুন্দর, ভেতরে পচা। বলেই জয়দেব দ্রুত বের হয়ে গেল।

নির্মল বাবু গেটের বাইরে এসে জয়দেবের জন্য অপেক্ষা করছেন। হন হন করে জয়দেব দক্ষিণ দিক থেকে আসছে দেখে নির্মল বাবু একটু এগিয়ে গেলেন। অন্যদিনের তুলনায় আজ জয়দেবকে উদভ্রান্ত লাগছে। এটা দেখেই নির্মল বাবু বুঝতে পারলেন।

–আসুন জয়দেবদা। বলে নির্মল বাবু হ্যান্ডশেক করার জন্য হাত বাড়িয়ে দিলো। একথা-সেকথা বলতে বলতে তারা ঘরে গিয়ে বসলো।

নির্মল বাবু নিজের হাতে চা বানিয়ে আনলেন। দু'জনে চা নিয়ে বসলো।

–যে কারণে আপনার কাছে আসা নির্মলদা, আশা করি আপনার কাছে সু-পরার্শই পাবো। ব্যাপারটা এমন গোপনীয় যে আপনার কাছে বলতেও লজ্জা পাচ্ছি কিন্তু না বলেও পারছি না।

–বেশি গোপনীয় হলে আমার কাছে না বলাটাই...। কথা শেষ করলেন না নির্মল বাবু। অনুমান করতে পারছেন যে একটা কিছু ঘটেছে।

–না, না বললে তো সমস্যা সমাধান হবে না। আপনি ঠান্ডা মাথায় বিবেচনা করে দেখবেন যে আমি কিছু ভুল করছি কিনা। আজ থেকে মধুমিতাকে স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছি। কাজটা কেমন হলো বলে আপনার মনে হয়?

–কিন্তু কেন? একটু ইংরেজি না জানলে কী এদেশে চলতে পারবে?

–ইংরেজি শেখার নামে সে উগ্র হয়ে যাচ্ছে। যা ইচ্ছে তাই পোশাক পরছে, আধুনিকের নামে একেবারে বেলেলস্নাপনা শুরম্ন করেছে। যার কারণে আজ কঠিন শাস্তি দিয়েছি। শেষ পর্যন্ত দেশে পাঠিয়ে দেওয়া লাগে কিনা কে জানে। তাকে ঠিক রাখতে না পারলে ছেলেমেয়েগুলো উচ্ছন্নে যাবে।

–এতদিন পড়ালেখা নিয়ে ব্যস্ত ছিলো, ভালো ছিলো। এখন ব্যস্ততা না থাকলে তো আরো এদিক-সেদিক হয়ে যাবে।

–ঢেঁকি নাকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে; আমাদের বাঙালি কমিউনিটির অবস্থা সে রকম। আমার বৌটাকে একেবারে নষ্ট করে দিলো কানকথা বলে। একে তো নাচুনি বুড়ি, তার উপর ঢোলের বাড়ি। যদি প্রশ্ন করি, এটা কার কাছে শিখলে, ওটা কে বললো? একেক সময় একেক জনের নাম আসে। আর আমার কম আক্কেল স্ত্রী-টা যে যা বলে সেটাই বিশ্বাস করে এবং সেটা নিয়ে আমার সাথে লেগে যায়। দিন দিন সে আমার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। যখন বাসায় ফোন করি, তখনই এনগেজড পাই। বাসায় এসে জিজ্ঞাসা করলে বলে ওর মা, তার মাসি, অমুকের মা, তমুকের মা ফোন করেছে। আর তারাও তাদের যত জ্ঞান আছে আমার স্ত্রীকে দান করে ধন্য করছে।

–পরচর্চা পরনিন্দা তো আমাদের বাঙালি ঐতিহ্য। এটা আপনি বন্ধ করতে পারবেন না। কিছু লোক আছে যারা কোনো কাজকর্ম করে না। সারাদিন ওর কথা তাকে, তার কথা ওকে বলে বেড়াবে। ফোন বন্ধ রাখবেন, তা-ও পারবেন না। এদেশে একদিন ফোন না থাকলে জীবন অচল।

–তাহলে সমাধান কী নির্মলদা?

–সমাধান তো আমি কিছু দেখি না। যারা ঝগড়া-ঝাটির রসদ সরবরাহ করে বলে আপনার মনে হয় আস্তে আস্তে তাদের সাথে যোগাযোগ কমিয়ে দিতে হবে এবং বৌদিকে বোঝাতে হবে যে বাইরের সব লোক বন্ধু নয়।

–আমার কোনো কথাই শুনতে চায় না সে। অন্যেরা যা বলে সেটাকে সত্য মনে করে আর আমি যেটা বলি সেটাকে মিথ্যে ভাবে। এর মধ্যে বেশ কয়েকজন আছে যারা ওর মাথাটা খেয়ে ফেলেছে বলতে গেলে।

–আপনি কাদের কথা বলছেন আমি অনুমান করতে পারছি। এরা চোরকে বলবে চুরি করতে গেরস্থকে বলবে সজাগ থাকতে। সাপ মারবে কিন্তু লাঠি ভাঙবে না। আপনার থেকে সস্তায় কথা কিনবে, অন্যজনের কাছে চড়া দামে বিক্রি করবে। সবার কাছে ভালো থাকবে। দ্বিমুখী চরিত্র যাকে বলে।

–আপনি দেখি সবই জানেন নির্মলদা।

–জানবো না? দেখতে, দেখতে কতটা বছর চলে গেল না এখানে? আপনি মহিলাদের কথা কী বলবেন, পুরম্নষগুলোও কম নাকি? এদের আত্ম মর্যাদা যদি থাকতো । দেখেন না, আমি পারতে এখন কারো সাথে আন্তরিকভাবে মিশি না। আপনারা ছাড়া এখন আর আমি কারো সাথে তেমন একটা মেলামশা করি না। এমন সব তুচ্ছ বিষয় নিয়ে তর্ক-বিতর্ক বাধে যে মাঝে মাঝে হাসতেও ভুলে যাই।

–এরা কেন আমেরিকা এসেছে বলতে পারবেন?

–আপনি, আমি যে, কারণে এসেছি, তারাও ঐ একই কারণে এসেছে। ঐ যে বললেন না ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে। অনেকেই আবার পড়ালেখা করে ভালো চাকরি করছে, ব্যবসা করছে। দেশে থাকলে যেটা কল্পনাও করা যেত না। আমরা নিজেরা নষ্ট না হলে অন্য কার সাধ্য আমাদের নষ্ট করে?

–এই যা বলেছেন। সে জন্যই স্কুল বন্ধ করে দিয়েছি। শুধু নষ্টামিটা চোখে পড়ে ভালোটা চোখে পড়ে না। কঠিন শাস্তি দিয়েছি আজ। এখনো শাস্তি চলছে।

–কী শাস্তি? কৌতুহল নিয়ে জানতে চাইলেন নির্মল বাবু।

মুখের কাছে এনেও জয়দেব বললো না। নিজের স্ত্রী তো। বন্ধুর কাছে স্ত্রীকে খাটো করা যায় না। অনেক কথাই সে বলেনি।

–না থাক, সেটা আপনাকে বলা যাবে না। জয়দেব বললো।

–যেটা বলা যাবে না সেটা বলবেন না। তবে আইন-আদালতের দিকেও খেয়াল রাখতে হবে। সংসারজীবনে সমস্যা থাকবেই কিন্তু সেটা যেন ভদ্রতার গন্ডি পার হয়ে না যায়। জীবনকে গড়ে নেবার জন্য এমন সুন্দর দেশ আপনি আর কোথায় পাবেন?

–এই সুন্দর তো সবাই দেখে না দাদা। যেমন আমার স্ত্রী-ই দেখে না। তাকে যদি আমি বলি এটা ঠিক, সে করে ঠিক তার বিপরীতটা। তার কথা একটাই বাংলাদেশে যা করেছি, আমেরিকা এসেও তাই করবো নাকি? তাহলে আর আমেরিকা আসলাম কেন?

–আসলে তিনি কী করতে চান?

–সেটা সে জানে না, আসলে সে কী করতে চায়। সেটাই হলো মূল সমস্যা। পারিপার্শ্বিকতা তাকে খুব আক্রান্ত করেছে। আর সে সাথে ঐ মহিলাগুলোর উস্কানি। মাথাটা ওর গেছে একেবারে।

–সেদিন বৌদি আমাকে বলেছিলো সে চাকরি করতে চায়। দেখতে পারেন চিন্তা করে। কাজের মধ্যে ব্যস্ত থাকলে হয়তো সময় ভালো কাটবে। সংসারে বাড়তি পয়সাও আসলো। বললো নির্মল বাবু।

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলো জয়দেব। –সবকিছু নিয়েই ভাবছি নির্মলদা। কোনটা যে সঠিক সেটাই বুঝে উঠতে পারছি না। চাকরি করতে চায় সেটা ভালো কথা কিন্তু যখন বেতন পেতে শুরু করবে তখন নিজেকে স্বাবলম্বী ভেবে যদি আবার বিগড়ে যায়? যদি মনে করে নিজে তো আয় করছি, অন্যজনকে আবার হুজুর হুজুর করবো কেন? এখানে বাংলাদেশি কয়েকজন মহিলা চাকরি করে বা না করে গোপনে দেশে বাপ-ভাইয়ের জন্য টাকা পাঠানোর খবর আমার জানা আছে। সে নিয়ে কয়েকটি পরিবারে ঝগড়া-ঝাটি তো নৈমিত্তিক ব্যাপার। আমার মনে হয় আমি বোধহয় ভুল করেছি নির্মলদা। সবকিছু দিনদিন যেন আমার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে।

–এত হতাশ হবেন না তো। সে একা মহিলা মানুষ এমন কী করতে পারবে? নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে আপনি দেখবেন না? মহিলাদের দৌড় হলো মার্কেট পর্যন্ত। এটা-সেটা কিনবে, দৌড় শেষ।

–তাহলে বলছেন মধুমিতাকে কাজে লাগিয়ে দিলে ভালো থাকবে? জয়দেব প্রশ্ন করলো।

–কাজ করলেই যে ভালো থাকবে সে কথা আমি বলছি না। আপনার কথা প্রসঙ্গে বললাম-কাজে ব্যস্ত থাকলে হয়তো বিগড়ে যাবার সম্ভাবনা না-ও থাকতে পারে। অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা একটা কথা চালু আছে না?

–কর্মব্যস্ত লোকদের মধ্যেও শয়তানি আছে নির্মলদা। শুধু অলস লোক নয়। দুষ্টু লোকগুলো সারাদিন কাজের পরেও অন্য লোকদের পেছনে লেগে থাকে। যার যা কাজ, বুঝলেন না?

মাথা নেড়ে নির্মল বাবু সায় দিলেন জয়দেবের কথায়।

–আমি তাহলে উঠি নির্মলদা। জয়দেব উঠে দাঁড়াল।

–যাবেন? আপনার কথা শুনে তো এখন আমার মধ্যে ভয় ধরেছে। স্ত্রী-সন্তানের জন্য আবেদন করেছি। এখানে এসে না আবার বিগড়ে যায়। জীবনটাকে আবার ওলট-পালট করে দেয়।

–সবাই তো আর একরকম হয় না। সবাই এক রকম হলে আর এখানে এত বড় বাংলাদেশি কমিউনিটি কী গড়ে উঠতো? কিছু লোক আছে জীবনে কোনোদিন পরিবর্তন হতে পারে না। বদলে দাও, বদলে যাও, দিন বদল, উই নিড চেঞ্জ কোনোকিছু তাদের স্পর্শ করে না। মানে বলতে চাই যে নির্ধারিত একটা বৃত্ত থেকে তারা বের হতে পারে না। আমার স্ত্রী হয়তো তাদের দলের একজন।

–সংকীর্ণতার বেড়াজাল থেকে নিজেকে মুক্ত করা মোটেও কোনো সহজ কাজ নয় দাদা। আপনি যতটা চিন্তা করছেন বৌদি হয়তো ততটা বিগড়ে না-ও যেতে পারে। দুষ্টু প্রতিবেশীরা তার কান ভারি করছে মনে করলে আস্তে আস্তে তাদের সাথে যোগাযোগ কমিয়ে দিন।

–দেখি, কী করা যায়। সব বিষয় তো আপনার সাথেই আলাপ করি। কোথাও ভুল করছি কিনা দেখবেন।

–ভুলেও এসব কথা অন্য কারো সাথে শেয়ার করবেন না। তাহলে আর রক্ষে নেই। একজনের কানে গেল তো সোয়াইন ফ্লুর মতো তা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে। সে সাথে নিজের মনের মাধুরী মিশিয়ে তিলকে তাল বানিয়ে বাজারে ছড়িয়ে দিবে।

স্নান করে, ঠাকুর পূজা সেরে পাতলা একটা শাড়ি পরেছে মধুমিতা। কপালে বড় করে সিঁদুরের ফোটা দিয়েছে। উজ্জ্বল শ্যামলা চেহারার মাঝারি গড়নের মধুমিতাকে শাড়িতে বেশ মানিয়েছে। হাতে শাঁখা আছে, সেগুলো সে খোলেনি। মনের মাধুরী মিশিয়ে কুচি দিয়ে শাড়ি পরেছে সে। খাটের এক কোণে আনমনে বসে আছে সে।

কলিং বেল বেজে উঠলো।

-হু ইজ দেয়ার? বেডরুম থেকে প্রশ্ন করলো মধুমিতা।
-আমি। দরজা খোলো। জয়দেব বললো।
-আমি তো একপায়ে দাঁড়িয়ে আছি, দরজা খুলবো কী করে? ভেতর থেকে জবাব দিলো মধুমিতা।
-শাস্তির মেয়াদ শেষ। দরজা খোলো।
মধুমিতা এসে দরজা খুলে দিলো।
ভেতরে এসে স্ত্রীকে দেখে অবাক হলো জয়দেব। এ সে কাকে দেখছে? একঘণ্টা আগে শার্ট-প্যান্ট পরা নগ্ন বক্ষদেশ মধুমিতা আর সাধারণ শাড়ি-বস্নাউজ পরা একই মধুমিতার মধ্যে এত পার্থক্য? সে যেন স্ত্রীকে চিনতে পারছে না। অবাক বিস্ময়ে সে বারবার স্ত্রীর আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করছে।
-কী দেখছো অমন করে? সিনেমার নায়িকাদের ঢংয়ে বললো মধুমিতা।
-তোমাকে। তোমাকে এত সুন্দর তো এর আগে কখনো দেখিনি। বাহ বেশ। অপূর্ব লাগছে তোমাকে। এ সাধারণ শাড়িতেই তোমাকে এত সুন্দর লাগছে। কার জন্য এমন করে সাজলে?
-আমার আরো কতজন আছে না, তাদের জন্য। ঘরের মধ্যেও কী ঘোমটা দিতে হবে?
আবার ঘোমটা? বারবার ঘোমটার ব্যাপারটা সামনে চলে আসছে। এবার কী বলবে জয়দেব?
স্ত্রীকে খাটে নিয়ে বসালো জয়দেব। নিজে বসলো।
-অনর্থকই তুমি বিগড়ে যাচ্ছিলে। আমি যা পছন্দ করি না তা তুমি বেশি বেশি করে করছিলে শুধু আমাকে কষ্ট দেবার জন্য। কেন তুমি বুঝতে পারছো না যে তুমি নষ্ট হয়ে গেলে ছেলেমেয়েগুলোও নষ্ট হয়ে যাবে। ঐ সব উদ্ভট পোশাক যদি আর পরেছো তোমাকে আমি খেয়ে ফেলবো।
-তোমার জ্ঞান দেওয়া শেষ হয়েছে? আমি রান্না করতে যাবো। স্ত্রীর হাত ধরে টেনে জয়দেব ড্রেসিং টেবিলের সামনে নিয়ে দাঁড় করালো। পাশে দাঁড়ালো জয়দেব। স্ত্রীর কাঁধে হাত রাখলো সে। মধুমিতা তেমন আপত্তি করলো না কিন্তু সে খুব একটা ভালো অনুভব করছে না।
-আয়নার মধ্যে কী দেখতে পাচ্ছো? প্রশ্ন করলো জয়দেব।
-কী দেখবো? তোমাকে দেখছি আর বাংলাদেশি ক্ষেতটা দেখছি।
-আর কিছু দেখছো? মা-মাসি-পিসি-কাকি-শাশুড়ি?
-তারা এখানে কোথা থেকে আসবে? তোমার ঢং আমি বুঝি না। ছাড় আমাকে। জুতা মেরে গরম্ন দান।
-আমি গোটা বাংলাদেশকেই আয়নার মধ্যে দেখতে পাচ্ছি। সবুজ ধান ক্ষেত, সোনালি ফসল, নদ-নদী, পাখ-পাখালি সব।
-তো দেখ। প্রাণভরে দেখ। তোমার স্ত্রী শার্ট-প্যান্ট পরে আরেক জনের হাত ধরে চলে গেছে সেটা দেখ না? বাংলাদেশে সেটাও তো হয়। হয় না? ঝাঁঝালো গলায় বললো মধুমিতা।
-এত চ্যাটাং চ্যাটাং করছো কেন? সারাদিন কী মিটার অন করাই থাকে?
-তোমার মতো কাব্য আমি বুঝি না। একটু আগে কেমন ব্যবহারটা করলে, এখন আবার কাব্য করছে। শয়তান একটা। স্ত্রীর দোষ ছাড়া আর কিছু দেখে না। মধুমিতা স্বামীর হাতের নিচের থেকে চলে যেতে চেষ্টা করছে।
-তোমার ইচ্ছেই পূরণ হলো তো। আমার তো ইচ্ছে বলে কিছু নেই। আমি তো মেয়ে মানুষ। পরাধীন। তুমি একা একা কাব্য করো। নাটোরের বনলতা সেন, বাংলাদেশ ছেড়ে এখন আমেরিকা কেন? হাসলো মধুমিতা, হাসলো জয়দেবও। স্বামীর বাহু থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে মধুমিতা রান্নাঘরে চলে গেল।
-টমেটো দিয়ে পাতলা করে মশুরি ডাল রান্না করতে পারবে? বললো জয়দেব।
-পারবো না কেন? আমি গ্রামের মেয়ে না? আর কিছু খেলে বলো। এখন শুধু রান্নাবান্না করবো আর ঘরে বসে ডিম পাড়বো। স্কুলতো গেলই।
- ডিম পাড়লে সেটা তা-ও দিতে হবে। তা না হলে ডিম ফুটবে না।
- তুমি কী মুখ বন্ধ করবা? যাও, বন্ধুর কাছে যাও। বন্ধুর কাছে গিয়ে আমার বদনাম করে আসো।
-তুমি দুপুরের পরিমাণ রান্না করো। বিকালে যদি গাড়িটা পাই তাহলে সবাইকে নিয়ে হলিউড ঘুরিয়ে দেখিয়ে নিয়ে আসবো আর ফিরে আসার সময় তোমার নামে একটা পার্টি দিবো রেস্টুরেন্টে।

পার্টির নাম মধুমিতার সুমতি । বঙ্গা ললনা মধুমিতা শার্ট-প্যান্ট ছেড়ে শাড়িতে ফিরে এসেছে তার সৌজন্যে ডিনার পার্টি।

–আমার কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দিবা না কিন্তু। তুমি আমার জীবনটাকে তেজপাতা করে দিয়েছো।

–তো, সে তেজপাতাটা ডাইলে ফোঁড়ন দাও। বলতে বলতে জয়দেব রান্না ঘরের দিকে গেল। মুখে তার হাসির ঝলক। রান্নাঘরের দরজা ধরে দাঁড়াল সে।

–তুমি কী খোঁচা মেরে ছাড় কথা বলতে পারো না?

–না, পারি না। আমার বিদ্যার দৌড় তো তুমি জানো। ঐ বিদ্যায় এটুকুই যথেষ্ট। তাছাড়া আমার মুখে মধু, অন্তরে বিষ নেই। যাকে যা বলবো সামনা-সামনি বলবো।

–সামনা সামনিই এলাম, যা বলার বলো।

–হয় আমাকে চাকরি করতে দিবা না হয় দেশে পাঠিয়ে দিবা। কোনটা করবা? সিদ্ধান্ত তোমার।

–যদি কোনোটাই না করি?

–একটা কিছু তোমার করতেই হবে। সবকিছু তোমার মতো চলবে না। ঘরে বসে আমি কী করবো?

–কী করবা? আমার সেবাযত্ন করবা। ছেলেমেয়েদের দেখাশুনা করবা।

–বললা তো মুখে যা আসে। সারাদিন কতক্ষণ ঘরে থাকো যে তোমাকে ইয়ে করবো? আর ছেলেমেয়েরা কী এখনো ছোট? নাকি দুধ খায় কোনোটা?

–চাকরি করার জন্য এত উতলা হলে কেন? তুমি কী না খেয়ে আছে? নাকি তোমার কোনো কিছুর অভাব আছে?

–অতকথা তোমাকে বলা যাবে না। তোমার ঘর-সংসার সব ঠিক রেখে আমি কাজ করতে পারলে তোমার অসুবিধা কী?

–আমার অসুবিধা আছে। কাজকর্ম না থাকলে ঘরে বসে বাংলা সিনেমা দেখবা, গান শোনবা, কবিতা পড়বা, আমাকে নিয়ে কবিতা লেখবা, আমাকে ফোন করবা। সময় কাটানোর সব ব্যবস্থা আমি করে দিবো।

–আবার কাব্য? তুমি কী রান্নাঘর থেকে যাইবা? আজ এত প্রেম জাগলো কেন? তোমার অন্য কোনো মতলব আছে। মধুমিতা চুলায় রান্না বসিয়ে দিয়েছে।

–মতলববাজদের মতলব তো থাকবেই। এমন সুন্দর সকাল, স্বামী-স্ত্রী একা ঘরে, শুধু খোঁচা মেরে কথা বলে একটা সকাল পার করে দিলে। তোমার হৃদয়ে কী কিছু নেই? মানুষ এত নিষ্ঠুর হয় কেমনে?

–তুমি আমাকে নিষ্ঠুর বানিয়েছো। আমার সব অধিকার কেড়ে নিয়েছো। আমাকে গৃহবন্দি করেছো। এমন জানলে আমি আমেরিকা আসতাম না। তুমি আমার সব সর্বনাশ করেছো।

–তুমি যা করতে চাচ্ছ তা একেবারেই বেলেল্লাপনা মধু। হিন্দু বাঙালি রমণীকে ঐভাবে মানায় না। সভ্যতা মানে কাপড়-চোপড় কমিয়ে আনা নয়। তোমার মনের মাঝে যে এত শয়তানি লুকানো আছে সেটা আমি আগে বুঝতে পারিনি।

–তুমি আমাকে আর মধু বলে ডাকবা না। তোমার মুখে ঐ ডাক শুনতে আমার আর ভালো লাগে না।

–তাহলে কী তোমাকে জোলি বলে ডাকবো? এঞ্জেলিনা জোলি? আসলে তোমার কোথায়ও যেন কী একটা সমস্যা আছে যেটা আমি বুঝতে পারছি না। তোমার ভিতর আর বাহির এক নয়। তা না হলে তুমি এত দ্রুত বদলে গেলে কেন? কেন তোমাকে নিয়ে আমার এত অনর্থক মনোকষ্ট পেতে হয়?

–বকবক বন্ধ করবা? যাও, ঘুমাও গিয়ে। রান্না হলে আমি ডাক দিবো।

–তোমার ডাকের অপেক্ষা করবো আমি? গ্যারেজ থেকে ফোন এলেই গাড়ি নিয়ে বের হয়ে যাবো। তোমার মতো স্ত্রীর কাছে না থেকে বাইরে গিয়ে বসে থাকা অনেক ভালো। তুমি আমাকে এখন একটি জঞ্জাল বলে মনে করছো। তোমার হৃদয় থেকে সব ভালোবাসা উঠে গেছে। তোমার নাম মধু না বিষ। মধুমালা না বিষের জ্বালা। তুমি আমার জীবনটাকে অঙ্গার করে দিয়েছো। আমার সব স্বপ্ন ভেঙে চুরমার করে দিয়েছো। তুমি একটা ঝগড়াটে মহিলা।

রান্নাঘর থেকে চলে গেল জয়দেব। শব্দ করে বেডরুমের দরজা আটকিয়ে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লো সে। চোখ বন্ধ করলো। অযথা তর্ক-বির্তক করে লাভ কী?

১০/১১ মিনিট পর মধুমিতা বেডরুমের দরজা টোকা দিলো।

–দরজা খোলো, তোমার জন্য চা বানিয়েছি।

দরজা না খুলেই জয়দেব জবাব দিলো–আমি খাবো না তোমার চা।
–তাহলে কী করবো চা? দরজা খোল।
–তোমার মাথায় ঢালো। কে বলেছে তোমাকে চা বানাতে?
–দরজা খুলবা না? মাফ চাই, ভুল হয়ে গেছে।
–শয়তানের আবার ভুল হয় নাকি? যাও, চা খাবো না আমি।
বিছানায় লম্বা হয়ে শুয়ে আছে জয়দেব। এ সময় ঘুম আসার কথা নয়। এ সময় কখনও বাসায় থাকা হয় না তার।
রান্নাঘর থেকে জোরে জোরে কথা বলছে মধুমিতা।
–এই দিন দিন না আরো দিন আছে। আবার আমার হাতের চা খাবে তুমি। মানুষ একটা ভুল করতে পারে। তার জন্য ক্ষমাও আছে। মধুমিতা তো মানুষ খুন করেনি যে তার ফাঁসি হয়ে যাবে।
দরজা খুলে রান্না ঘরে এলো জয়দেব।
–বকবক করছো কেন? যখন রান্নাঘরে এসেছিলাম এককাপ চা বানিয়ে দিতে তো পারতেন। ঘরে তো তুমি আর আমি ছাড়া কেউ নেই। আছে? আরো তো কত কিছু করতে পারতে। তোমার মতো এমন কিপটে মহিলা আমি জীবনে দেখিনি।
–আরো অনেক মহিলার সাথে তোমার সম্পর্ক আছে মনে হয়? তারা তোমাকে সব উজাড় করে দিয়ে দেয়? তা, যাও না তাদের কাছে। তোমাকে আগেই আমার সন্দেহ হয়েছিল। দেশে থাকতে যা শুনেছিলাম। একজনে ২/৩ জন রাখে। পুরুষ লোকগুলো ঐরকমই হয়।
–পুরুষ লোকগুলো ঐরকম হলেও তোমার মতো এমন হয় না। এমন সোনালি সকাল মাটি করে না। ডলারের নেশা তোমাকে পাগল করে ফেলেছে।
–এ নাও চা। খেয়ে কিছু বাজার করে আনো। পড়ালেখা তো গেল। এখন রান্না করি আর ডিম পাড়ি।
স্বামীর হাতে চা দিলো মধুমিতা। জয়দেব চায়ের কাপ ধরে দাঁড়িয়ে আছে। নতুন করে যেন স্ত্রীকে দেখছে সে।
–এত ঢং করো না, খাও। এই বাজারের লিস্ট। বাজার করে আনো।
–আমি বাজারে যেতে পারবো না। আমি ফোনের অপেক্ষায় আছি। গাড়ি ঠিক হলেই বেরিয়ে পড়বো। যেখানে স্বামী একটি তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের পাত্র সেখানে স্বামীদের না থাকাই ভালো। স্ত্রী যদি দজ্জাল হয় স্বামী কী আর সুখী হতে পারে?
–বিকালে ছেলেমেয়েদের নিয়ে বের হবে বললে না? এক মুখে ক'কথা বলবে?
–বের হতাম। তোমার আচরণে সব ওলট-পালট হয়ে গেছে।
–সব তো আমারই দোষ। নন্দঘোষেরও এত দোষ নেই। আমি করলাম তোমার সংসার। অন্য কেউ হলে করতো না।
স্ত্রীর দেওয়া তালিকা নিয়ে জনস্ মার্কেটে গেল জয়দেব। মনটা বেশি ভালো নেই তার। আবার একেবারে খারাপও নেই। একমনে তালিকা মোতাবেক মালামাল ঝুড়িতে নিচ্ছে জয়দেব।
পেছন থেকে মেয়েলি কণ্ঠ–জয়দেব দা। জয়দেব পিছন ফিরে তাকালো। রুপালি এসেছে বাজার করতে। কোলে তার ছেলে।
–কেমন আছেন দাদা? আপনার তো দেখাই পাওয়া যায় না। বাজার করতে এলেন বুঝি?
–হ্যাঁ সামান্য বাজার দরকার। শেষ কথার জবাব দিলো জয়দেব।
–আজকে কাজে যাননি? বৌদি স্কুলে গিয়েছে? দ্রুত কথা বলছে রুপালি? যেন তার অনেক কথা বলার আছে। যদি সময় ফুরিয়ে যায়।
–না, আজকে কাজে যাইনি এখনো। গাড়িটা খারাপ হয়েছে। মেরামত করতে দিয়েছি। আপনি কী বাজার করতে এসেছেন?
–হ্যাঁ দাদা। আমিই তো বাজার করি। সুব্রতের বাবাকে দিয়ে আমি বাজার করাই না। ওর বাবা একদম বাজার করতে পারে না। একটার কথা বললে আর একটা নিয়ে যায়।
–এ কথা আমি আরো অনেকের কাছেই শুনেছি। বাংলাদেশ থেকে আসার সময় অনেক মহিলাই নাকি শপিংয়ের উপর পিএইচডি ডিগ্রি নিয়ে আসে, যদি পুরুষরা বাজার করতে না পারে এখানে।

মুখ অন্ধকার হয়ে গেল রূপালির। জয়দেব কী বলেছে রূপালির তা বুঝতে কষ্ট হয়নি। প্রসঙ্গ পাল্টালো রূপালি।

–আপনাকে আমি মনে মনে খুঁজছিলাম। কিছু কথা আছে আসেন এই দিকে।

জয়দেবের হাত ধরে টেনে এক কোণায় নিয়ে গেল রূপালি।

–শোনেন দাদা, আপনজন বলেই কথাটা বলছি। মহিলাদের অত উস্কানি দিবেন না। মহিলারা হলো ঘরের লক্ষ্মী। ঘরের লক্ষ্মী থাকবে ঘরের কোণায়। বৌদি স্কুলে যায়। কী সব ছাই ভস্ম শিখে। একদিন দেখবেন আপনাকেই কেনাবেচা করছে। ইংরেজি শিখে লাভ কী? সে কী এদেশে জর্জ ব্যারিস্টার হবে? মহিলাদের অত মাথায় তুলতে নেই।

–কেন, আপনি কী মধুমিতার খারাপ কোনো আচরণ দেখেছেন? কিছুটা বিস্মিত হলো জয়দেব। আবার তার মনে হলো রূপালিও একজন মহিলা। একজনের বিবাহিতা স্ত্রী। সে নিজেও স্কুলে গিয়ে ইংরেজি শিখেছে।

–মহিলারা ঘরে থাকবে, রান্নাবান্না করবে, ছেলেমেয়েদের দেখাশুনা করবে, স্বামীর সেবা-যত্ন করবে। মহিলারা যদি বাইরে ঢ্যাং ঢ্যাং করে তবে এসব করবে কে?

–ওকে তো আজকে থেকে স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছি। ঢ্যাং ঢ্যাং শেষ।

–ভালো কাজ করেছেন। কাজের কাজ করেছেন। মহিলাদের এত কী ইংরেজি শেখা? মহিলারা ইংরেজি শিখে কী করবে? সবদিকে নজর রাখবেন। এদেশে এলেই মহিলারা আর স্বামীদের চিনে না। যেন একটা কিছু হয়ে যায়।

–ঠিক বলেছেন বৌদি। মহিলাগুলো আসলেই আস্ত ইডিয়েট। যেতে উদ্যত হলো জয়দেব।

আবার মুখ কালো করলো রূপালি। জয়দেবকে হাতে ধরে তার যাওয়া থামালো।

–আপনার সাথে যে আমার দেখা হয়েছে, কথা হয়েছে, একথা যেন আবার বৌদিকে বলবেন না। তাহলে আবার কী না কী মনে করে কে জানে। মহিলাদের মনে তো আবার সব সময় একটা সন্দেহ সন্দেহ ভাব থাকে। নতুন যারা আসে তাদের বেলা তো কথাই নেই।

–ঠিকই বলেছেন বৌদি। সেদিন একজনের সাথে আমার এ নিয়ে কথা হচ্ছিল, সে বললো পুরোনো মহিলাগুলো নাকি শয়তানের হাড্ডি। পুরনোগুলো নাকি নতুনগুলোর মাথা খায়। কথাটা কী সত্যি?

পুরনো মহিলারা নতুন মহিলাদের মাথা খায় এ-কথায় রূপালির কোনো ভাবান্তর লক্ষ করা গেল না। সে নিজে পুরনো নাকি নতুন নাকি এর কোনোটাই না, ঠিক মিলাতে পারছে না।

–কী জানি খেলেও খেতে পারে। কতজনই তো কতজনের মাথা খাচ্ছে। দায়সারা জবাব দিলো রূপালি। এবার রূপালি যেতে উদ্যত হলো।

–দাদা কী এখন কাজে? সেদিন মধুমিতাকে নিয়ে গাড়িতে গ্যাস ভরতে দাদার গ্যাস স্টেশনে গিয়েছিলাম। আমরা অবশ্য বাইরে থেকেই চলে এসেছি।

এবার তড়িঘড়ি করে চলে যেতে চাইছে রূপালি। কিছুদিন আগে মধুমিতাকে সে বলেছিল যে তার স্বামী সরকারি চাকরি করে।

–যাই দাদা। বাজার করার পর বাসায় অনেক কাজ পড়ে আছে। বৌদিকে, ছেলেমেয়েকে নিয়ে বাসায় যাবেন।

–আচ্ছা ঠিক আছে। বলে জয়দেব বাজার করতে আরম্ভ করলো। রূপালি দ্রুত তার নজরের বাইরে চলে গেল।

দুপুর হয়ে গেছে। জয়দেব বাজার করে বাসায় ফিরেছে।

ফোন বেজে উঠল। জয়দেব ফোন রিসিভ করলো। হ্যালো বলতেই অপর প্রান্ত থেকে রূপালির গলা শোনা গেল। জয়দেব ফোন রিসিভ করেছে দেখে রূপালি পরে ফোন করবে বলে তড়িঘড়ি রেখে দিলো।

রান্নাঘরে বাজার সওদা রেখে জয়দেব হাতমুখ ধুয়ে সোফায় বসল।

মধুমিতা এসে স্বামীর সামনে দাঁড়ালো। গ্যারেজ থেকে হোজে নামে একজন ফোন করেছে। বলেছে তিনটার পর গিয়ে গাড়ি নিয়ে আসতে।

–ভালোই হলো। যত তাড়াতাড়ি বের হওয়া যায় ততোই ভালো।

–কেন, ঘরে তোমাকে কেউ কামড়ায় নাকি?

–যেসব মহিলার হৃদয় বলতে কিছু নেই সেসব মহিলার কাছে আমি থাকি না। জয়দেব উঠে দাঁড়ালো।

–রান্নাবান্না শেষ। খেয়ে একটা ঘুম দাও। তারপর গাড়ি নিয়ে এসো। আজ আর গাড়ি চালাতে হবে না। বিকালে ওদের নিয়ে বের হবে।

–দেখি কী করা যায়। খেতে বসলো জয়দেব।

ছেলেমেয়েরা স্কুল থেকে এসে স্নান করে খেতে বসেছে। ফোন বেজে উঠলো। অপর প্রান্তে রূপালির কণ্ঠস্বর।

–হ্যালো বৌদি, আমি রূপালি।

–হ্যাঁ, বুঝতে পারছি বলুন।

–ঐ সময় ফোন করেছিলাম, দাদা ঘরে ছিল বলে কথা বলিনি। দাদা কী এখন ঘরে?

–না, ঘরে নেই। গাড়ি আনতে গেছে। আপনি বলুন, আমি শুনছি।

–কী আর বলবো, সকালে দাদার সাথে জন্স মার্কেটে দেখা। আপনার কথা জিজ্ঞাসা করতেই বললো আপনাকে নাকি আর স্কুলে যেতে দিবে না। আমি শুনে সাংঘাতিক কষ্ট পেলাম। দাদা কী এটা কোনো ভালো কাজ করলো?

–কী আর করা বৌদি, কর্তার ইচ্ছায় কীর্তন। স্বামী যদি স্কুলে যেতে না দেয় তাহলে আর কী করবো?

–আগেই আপনাকে বলেছিলাম, খেয়াল আছে? এখন হাতে-নাতে প্রমাণ পেলেন তো? আপনি চাইলে কাল থেকেই আবার স্কুলে যেতে পারেন। এটা আইনের দেশ। কারো স্কুলে যাওয়া কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারে না।

–কী করবো এখন? স্বামীর সংসার করতে হলে স্বামীর কথামতো চলতে হবে না? আবার স্কুলে যেতে চাইলেই লংকাকান্ড বাঁধিয়ে বসবে।

–রাখেন তো আপনার স্বামী। এই আপনাদের মতো নতুন লোকদের নিয়ে হয়েছে যত জ্বালা। স্বামী যা চাইবে, তা-ই হবে কেন? তার ব্যতিক্রম হতে পারবে না?

–আমাকে এখন কী করতে বলেন বৌদি?

–কী করবেন, আগামী দিন থেকে আবার স্কুলে যাবেন। এটা মগের মুলস্নুক নাকি?

–যদি প্রিয়ন্তির বাবা যেতে না দেয়?

–হুলস্থুল বাঁধিয়ে দিবেন। আমি আপনাকে একথা বলেছি দাদাকে আবার বলবেন না যেন। তাহলে আবার কী না কী মনে করে। পুরম্নষ মানুষ তো? মনের মধ্যে একটা সন্দেহ সব সময়ই থাকে।

–আপনার কথা বলবো, আপনার কী মাথা খারাপ নাকি? ভালোমন্দ দু'একটা পরামর্শ আপনি ছাড়া আর কে দেয়? বাসায় আসুক দেখি, একবার বলবো। আপোসে রাজি না হলে ত্রিপোলি কান্ড বাঁধিয়ে বসবো।

– ত্রিপোলি কান্ড কোনটা? ঠিক বুঝলাম না।

– ঐ যে লোকে বলে না লংকাকান্ড। শ্রীলংকার রাজধানী ত্রিপোলি। যে কোনো দেশের রাজধানীই তো আসল। রাবণ সে সব কান্ড লংকায় না ঘটিয়ে যদি লস এঞ্জেলেসে ঘটাতো কত মজা হতো না?

জোরে জোরে হাসলো রূপালি।

–আপনি তো খুব ভালো রসিকতা জানেন বৌদি। দাদা সে জন্যই আপনাকে পছন্দ করেছে। সুব্রতের বাবাও রসিকতা খুব পছন্দ করে। এখানে বাঙালি কমিউনিটিতে রসিকতায় কেউ পারবে না। সে দিন আমাকে কী বলে জানেন?

–কী? আমি জানবো কী করে? আমি কী আপনাদের ঘরে থাকি নাকি?

–বলে আমি হাসলে নাকি আমাকে নায়িকা রেখার মতো লাগে। এই নিয়ে কী হাসাহাসি। বলেন, এমন রসিক লোক আর হয়?

–না, হয় না। কী আর বলবো বৌদি, বিয়ের পর থেকেই প্রিয়ন্তির বাবা আমাকে নায়িকা মধুমালা বলতে আরম্ভ করলো। আমার নামতো মধুমিতা। শেষের মিতাটুকু বাদ দিয়ে মালা যোগ করে মধুমালা ডাকতে আরম্ভ করলো। রসিক আর কাকে বলে।

–আরে দুত। বাদ দিন তো। কোথায় রেখা আর কোথায় মধুমালা। মধুমালার দিন আছে এখন? কার সাথে কার তুলনা করেন।

মধুমিতা দেখলো রেখার কাছে যখন মধুমালা টিকতে পারছে না তখন প্রসঙ্গ পাল্টানো দরকার। বারবার সে জিতে যাবে, এটা হতে দেওয়া যায় না।

–আরে বৌদি, আপনাকে তো বলাই হয়নি সেদিন প্রিয়ন্তির বাবার সাথে গিয়ে আপনাদের দাদাকে দেখে এলাম। সরকারি চাকরি করছে। আমরা অবশ্য বাইরে থেকেই চলে এসেছি। আমাদেরকে দেখতে পায়নি।

রূপালির খুব দ্রুত মনে পড়েছে যে মধুমিতাকে সে বলেছিল তার স্বামী সরকারি চাকরি করে।

–এখন তাহলে রাখি বৌদি। একটু ব্যস্ত হয়ে পড়েছি। পরে আবার কথা হবে।

–আচ্ছা ঠিক আছে। বলে মধুমিতা ফোন রেখে দিলো।

জয়দেব গাড়ি নিয়ে ফিরে এসে সবাইকে নিয়ে বিকেলে হলিউড এলাকা ঘুরিয়ে দেখিয়ে আনলো। ইউনিভার্সেল স্টুডিও, ইউনিভার্সেল সিটি, গ্রিফিত পার্ক, প্যাসেডিনাসহ আরো অনেক এলাকা তারা আগেই দেখেছে।

সন্ধ্যার পর ইন্ডিয়ান একটি রেস্টুরেন্টে খাওয়া-দাওয়া শেষে তারা বাসায় ফিরছে। মধুমিতা দেখলো স্বামীর সাথে কথা বলার জন্য এখনই উপযুক্ত সময়। সে এখন ভালো মুডে আছে। ড্রাইভ করছে জয়দেব। মধুমিতা সামনের সিটে বসেছে। ছেলেমেয়েরা পিছনের সিটে বসে নিজেদের মধ্যে কথা বলছে।

–এতকিছু খেলাম, এতকিছু দেখলাম, হলিউডে কোনো ডাইলের পানি তো দেখলাম না, খেলামও না। বললো মধুমিতা।

–তোমার পিঠে গোটা কয়েক দিলেই ডাইলের পানি দেখতে পাবা। সুখে থাকলে ভুতে কিলায়? জয়দেব বললো।

–ভুতে কিলাক আর যে-ই কিলাক আমি কিন্তু আগামী দিন থেকে আবার স্কুলে যাবো।

–তোমার পা ভেঙে আমি গলায় ঝুলিয়ে দিবো আবার যদি স্কুলের নাম মুখে এনেছো।

–এত সস্তা না। রূপালি বৌদি বলেছে এদেশে কারো স্কুলে যাওয়া কেউ বন্ধ করতে করতে পারে না। এটা মগের মুলস্নুক না। তুমি আমার উপর বেআইনি হস্তক্ষেপ করেছো।

–রূপালি বৌদি বলেছে একথা? একদিনের মধ্যেই সব কথা আদান-প্রদান হয়ে গেছে? তোমাকে না বলেছি বাইরের কারো সাথে কোনো বিষয় নিয়া আলাপ-আলোচনা করবা না? সেজন্যই বোধহয় দুপুরে ফোন করেছিলো। আমাকে তো বললো তোমাকে স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দিয়ে আমি ভালো কাজই করেছি। মেয়েমানুষের এত ইংরেজি শিখে লাভ কী? তোমাকে আবার কখন ফোন করলো?

দাঁত কামড় দিলো মধুমিতা। রূপালি তাকে নিষেধ করেছিলো যাতে সে তার নাম না বলে যে সে মধুমিতাকে ফোন করেছিলো। কথা ঘোরানোর চেষ্টা করলো মধুমিতা। রূপালি বৌদিকে বিতর্কিত করা যাবে না। মাঝে মাঝে সে-ই তো ভালো ভালো পরামর্শ দেয় তাকে।

৫

একটি গ্রোসারি স্টোরে কাজ নিলো মধুমিতা। এখন সে আগের চেয়ে ব্যস্ত এবং আগের চেয়ে স্বাধীন। নিজেকে তার স্বাবলম্বী বলে মনে হয়। বেতন পেয়ে নিজের ইচ্ছেমতো বাজার করে আনে। কাজ করতে তার কষ্ট অনুভব হয় না এবং বাজারে যেতে অস্বস্তি বা ক্লান্তি কোনোটাই লাগে না। সারাদিন বাজারে বাজারে ঘুরতেও তার কোনো আপত্তি নেই। এ নিয়ে জয়দেবের সাথে মধুমিতার প্রায়ই তর্ক-বিতর্ক হয়। জয়দেবের আদেশ-নির্দেশ কোনো কাজে আসে না। একজন জীবন্ত মানুষকে ঘরে তালা মেরে রাখা যায় না। জয়দেব কাজ বন্ধ করে স্ত্রীকে পাহারা দিতে পারে না। তর্ক থেকে বিতর্ক। বিতর্ক থেকে ঝগড়া-ঝাটি এখন একটি নিয়মিত ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মনের দূরত্ব বাড়তে থাকে। এ কারণে ছেলেমেয়েরা একরোখা হতে থাকে।

নিজ ঘরে নিজেকে পরবাসী ভাবতে থাকে জয়দেব। সংসারে তার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে বলে অনুভূত হয় তার। দুঃস্বপ্ন দেখে সে। অসহায়ত্ব তাকে খুবলে খুবলে খায়। দু'নৌকায় পাড়া দিয়ে

কূলের ঠিকানা খুঁজে পায় না জয়দেব। একদিকে ছেলেমেয়েদের পড়ালেখা, আমেরিকার উন্নত জীবন অন্যদিকে স্ত্রীর বিগড়ে যাওয়া জয়দেবের জীবনকে উত্তরহীন এক প্রশ্নবোধকের সম্মুখীন করে তুলেছে।

বাংলাদেশে মায়ের কাছে ফোন করে মধুমিতা। আজ সে সোনালি এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে এক হাজার ডলার পাঠিয়েছে। সেটা জানাতে মধুমিতা মাকে ফোন করে।

–শোনো মা, এবার একসাথে এক হাজার ডলার পাঠালাম। তিনদিনের মধ্যেই টাকা পেয়ে যাবে। আর সহসা আমার কাছে টাকা চাইবে না।

–এক হাজার ডলার পাঠিয়েই কী ক্লান্ত হয়ে গেলি নাকি? জানিস, এখানে এখন জিনিসপত্রের দাম কেমন? তোর বাবা কী এখন আর রোজগার করতে পারে?

–আমি কী করবো মা? তোমার জামাইর সাথে অনেক যুদ্ধ করে তবে এ চাকরি শুরু করেছি। তাকে না জানিয়ে বারবার টাকা পাঠাই, এ নিয়ে তোমার জামাইর সাথে ঝগড়া হয়। সে চায় না আমি তোমাদেরকে টাকা পাঠাই।

–এটা তুই কী বলিস মধু? তার চাওয়া না চাওয়ায় কী আসে যায়? তুই রোজগার করিস, আমাদের জন্য পাঠাস। তার বাবার টাকা তো পাঠাস না। ঐদেশে ঐ ছাগলটাকে এত ভয় পাস কেন? আমরা কী মরে গেছি?

–আমি তো একজনের সংসার করি মা।

–সংসার করা কী তুই আমাকে শিখাবি? আমরা সংসার করি না? আমেরিকা গিয়ে সংসার করবি এমন তো কথা ছিল না বিয়ের আগে।

–মা তুমি বুঝতে চাইছো না, স্বামী যেখানে থাকবে স্ত্রীও সেখানে থাকবে। এটা আমেরিকা বা বাংলাদেশে থাকা নিয়ে কথা নয়।

কেঁদে দিলো মধুমিতার মা। তার চোখ দিয়ে জল পড়লো কিনা মধুমিতা তা বলতে পারবে না। তবে মায়ের কান্নাজড়িত কণ্ঠ সে শুনতে পাচ্ছে।

–থাক, তোর টাকা আমাদের লাগবে না। তোর টাকা যখন ছিল না তখন কী আমরা ভাত না খেয়ে ছিলাম? তোর বাবাকে বলবো তোর টাকা না ধরতে।

–মা, এতে এতো অভিমান করার কিছু নেই। এক হাজার ডলার মানে এক হাজার টাকা নয়। উনসত্তর হাজার টাকা। বলছি আর সহসা চাইবে না। আমি বলিনি যে আর কখনো দিবো না।

–থাক বাবা। টাকা দিয়ে আবার খোটা দিবি, সে টাকা আমাদের লাগবে না।

–মা, তোমাকে খোঁটা দিলাম কখন?

–কেন, এই যে বললি এক হাজার ডলার মানে এক হাজার টাকা নয়। বাংলাদেশে এমন কোনো মেয়ে আছে, যে মেয়ে আমেরিকা থেকে মা-বাবার জন্য টাকা পাঠিয়ে আবার খোটা দিবে? আমাদেরই পোড়াকপাল, তা না হলে এই বয়সে মেয়ের খোটা শুনবো কেন? ভাইটাকে তো নিতে পারলি না। নিতে পারলে আমাদের কী আর তোর উপর নির্ভর করতে হয়?

–আমি সব ব্যবস্থা করছি মা। তোমাকে এত অস্থির না হলেও চলবে। ভাইকে আনার ব্যাপার আমার মাথায় আছে। পারলে তোমাকে, বাবাকেও আনবো। এখন আর কথা বেশি বলবো না। কাজ করে টাকা পাঠিয়ে বাসায় এলাম। এখনো স্নান করিনি, খাইনি। একটু পর তোমার জামাই আসবে।

মধুমিতার মায়ের জড়ানো কণ্ঠস্বর আর নেই। তিনি চোখ মুছলেন কিনা সেটা মধুমিতা জিজ্ঞেস করেনি।

–যা ভালো বুঝিস কর। মা-বাবা বলে কথা। তোকে আমি পেটে ধরেছি আমি কষ্ট বুঝি। জয়দেব সেটার কী বুঝবে? এ বাঁদরটার কথা আমাকে আর বলবি না। আগে একটু ফোন করতো-কেমন আছেন, শরীরের যত্ন নিবেন। ব্যস, ঐ পর্যন্তই। এখন আর তা-ও করে না। একটা ডলার পাঠানো তো দূরের কথা। নিজেদের বাড়ি তো দালান ঠিকই করেছে।

–আমি এখন রাখি মা। তিনদিন পর আবার ফোন করবো টাকা পেয়েছো কিনা। ম্যানেজার বলেছে তিনদিনের আগেই টাকা পৌঁছে যাবে।

–আচ্ছা ঠিক আছে রাখ। তোর বাবাকে বলবো ব্যাংকে গিয়ে খবর নিতে। আর শোন, আমরা দুলুর বাপের ঐ জমিটা নিয়ে নিয়েছি। খুব শীঘ্রই দলিল করবো। কিছু টাকা বাকি আছে। কোনো সমস্যা হলে তোকে জানাবো। এই ব্যাপারে জয়দেবের সাথে কোনো আলাপ করবি না।

–আচ্ছা ঠিক আছে। বলেই মধুমিতা লাইন কেটে দিলো।

সন্ধ্যার পর জয়দেব স্ত্রীর কাছে চলতি মাসের কাজের বেতনের চেক চাইলো। মধুমিতা স্বামীর কথায় তেমন কর্ণপাত করছে না। বারবার শুনিনি-শুনিনি ভাব করছে। কাজের বেতনের চেক পেয়ে সেটা ক্যাশ করে মধুমিতা দেশে পাঠিয়ে দিয়েছে। যার কারণেই সে স্বামীর কথায় কর্ণপাত করছে না।

–বার বার তোমাকে যে বলছি এ মাসের চেক কোথায়, তোমার কী কানে যাচ্ছে না? নাকি কান বন্ধ হয়ে গেছে? জোরে জোরে বললো জয়দেব।

রান্নাঘরের একটি কৌটা থেকে মধুমিতা চেকের বাকি অংশ জয়দেবের সামনে ছুড়ে মারলো।

জয়দেব সেটি হাতে তুলে নিয়ে দেখলো এটি চেকের হিসাবের অংশ। মুলচেক এখানে নেই।

–আসল চেক কোথায়? ধমকের সাথে বললো জয়দেব।

–থাকলে তো দেখতেই পেতে। চোখ কী অন্ধ নাকি? মুখে ভেংচি কেটে জবাব দিলো মধুমিতা।

–চোখ যদি অন্ধ না হবে তবে তোমার মতো বজ্জাত মহিলাকে বিয়ে করবো কেন?

–তুমি তো চাও না আমি চাকরি করি, তাহলে আমার টাকা চাও কেন?

–অকথা আমি শুনতে চাই না। আমি জানতে চাই চেক কোথায়? এক কথায় ঠিক ঠিক জবাব চাই।

–চেক ভাঙিয়ে আমার মায়ের জন্য এক হাজার ডলার পাঠিয়েছি। আর সামান্য কিছু আছে। সেটা আমার ব্যক্তিগত কাজে লাগবে। এবার কলিজা ঠান্ডা হয়েছে?

–কার পারমিশন নিয়ে তোমার মায়ের কাছে টাকা পাঠিয়েছো? সিংহের মতো গর্জে উঠলো জয়দেব।

–টাকা পাঠাতে কারো পারমিশন লাগে না। তুমি কে, যে তোমার পারমিশন নিবো টাকা পাঠাতে? এখন থেকে আমার আয়ের এক টাকাও তোমাকে দিবো না। অনেক দিয়েছি। আর না। আমি ইনকাম করবো আর আমি খরচ করতে পারবো না। সেদিন শেষ।

–তোমাকে না নিষেধ করেছি ঐসব অকৃতজ্ঞ লোকদেরকে আর টাকা পাঠাবে না? একশো, দু'শো ডলার থেকে এবার এক হাজার ডলার? তারা কী তোমার কাছে টাকা পাবে নাকি? নাকি তাদের বাপের কালের ধন আছে এখানে?

–মুখ সামলে কথা বলবে। আমি আয় করে আমার বাবা-মাকে দিয়েছি। তোমার বাবার কী? তোমার বাবারটা দিয়েছি? তুমি যে মাসে মাসে তোমার বাবা-মার জন্য পাঠাও, আমি বাধা দিই? আমার বেলায় এত জ্বলে কেন? নরম পেয়েছো আমাকে? এখন নিজে রোজগার করি, কারো ধার ধারি না।

–কালকে থেকে তোমার কাজে যাওয়া বন্ধ। তিনদিনের মধ্যে পাচারকৃত টাকা ফেরত আনবে। তা না হলে তোমার কপালে দুর্ভোগ আছে।

–দুর্ভোগকে ভয় পায় না মধুমিতা। মধুমিতা এখন কাজ করে খায়। স্কুলে যাওয়া বন্ধ করেছো, সব স্বাধীনতা হরণ করে আমাকে পরাধীন বানিয়ে রেখেছো। আর পারবে না। দেখি কার বাবার সাধ্য আমাকে কাজে যাওয়া বন্ধ করে।

ক্রমান্বয়ে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে যাচ্ছে। ছেলেমেয়েরা এসে চারিপাশে দাঁড়িয়ে আছে। কেউ কোনো কথা বলছে না।

–তোরা এখানে এসেছিস কেন? ছেলেমেয়েদের জোরে ধমক দিলো মধুমিতা।

–মাকে দেশে পাঠিয়ে দাও তো বাবা। আমরা একা থাকতে পারবো। তোমাকে না বাবা বলেছে ঐ ঐ শয়তানগুলোকে আর টাকা দিবে না। শকুনের মতো কেবল আমেরিকার দিকে তাকিয়ে থাকে। বললো প্রিয়ন্তি।

–তবে রে হারামির বাচ্চা। আমার বাবা-মা শয়তান, তোর বাবা-মা ভালো? হাতের ডালের ঘুটনি মধুমিতা মেয়ের গায়ে ছুঁড়ে মারলো। প্রিয়ন্তি লাফ দিয়ে সরে যাওয়াতে তার গায়ে পড়লো না। জয়দেব দাঁড়িয়ে দেখছে।

–তোরা ঐ ঘরে যা তো বাবা, আমি দেখছি। টাকা কী করে ফেরত আনতে হয়। ছেলেমেয়েরা শোবার ঘরে চলে গেল।

হাড়ি-পাতিলের ঠাকুর-ঠুকুর শব্দ করে মধুমিতা রান্না করছে। জয়দেব পাশে দাঁড়িয়ে আছে।

–টাকা তাহলে তুমি ফেরত আনবে না? ধমকের সুরে বললো জয়দেব।

–বললাম তো না। ফেরত আনার জন্য কী পাঠিয়েছি নাকি? বারবার একই কথা।

–তবে দেশে যাবার জন্য প্রস্তুত হতে থাকো। আমার সংসার বিপন্ন করে সে কাজে যাবে আর দেশে বসে সোনার চাঁদেরা মজা করবে। টাকা পাঠানোর রিসিট কোথায়?

–রিসিট দিয়ে তুমি কী করবে?

–মামলা করবো। কালফিটগুলোকে জেলের ভাত খাওয়াবো।

–কার নামে মামলা করবা?

–যারা প্রতারণা করে অন্যের টাকা খায়। সংসারে অশান্তি সৃষ্টি করে ঐসব তথাকথিত বেনিফিসিয়ারিদের নামে। খেটে মরবে একজন, দাঁও মারবে আর একজন। খাওয়াবো আমেরিকার টাকা। শরমে বৌ ভাত খায় না, চালতার মতো লোকমা ধরে? আমার সাথে কথা বলে না, আমি লোক খারাপ। আমার স্ত্রীর সাথে গোপন ষড়যন্ত্র করে টাকা নেয়। বেশরম লোকজন। আমি ব্যাংকে ফোন করবো টাকা ট্রান্সপার না করার জন্য। অনলাইনে দেশে থানায় জিডি করবো। গুহায় বাস করে আমেরিকার শান্তি ভঙ্গ? এবার দেখাবো মজা। কত ধানে কত খই।

–তোমার এসব মামলা-হামলারে মধুমিতা ভয় পায় না। সবাই এখান থেকে গোপনে মা-বাবার জন্য টাকা পাঠায়। কারো বেলা দোষ না হলে আমার বেলা দোষ হবে কেন। মেয়ে আমেরিকা থাকে। বাবা-মা কিছু টাকা পেতে পারে না? তুমি তো কুলাঙ্গার জামাই। তুমি তো আর পাঠাবে না। আমাকেই পাঠাতে হবে।

–মুখ সামনে কথা বলো। তা না হলে দুই থাপ্পরে ত্রিশটা দাঁত ফেলে দিবো। এ জন্যই চাকরি করার এত গরজ? মা-বাবার স্বার্থ উদ্ধারের জন্য আমেরিকায় শুভাগমন?

–কী মুখ সামলাবো? এবার আর কোনো সামলা-সামলি নেই। মানুষ তো বলে এক থাপ্পড়ে বত্রিশ দাঁত ফেলে দিবো। তুমি দুই থাপ্পড়ে ত্রিশটা ফেলবে কেন? বাকি দুইটা দিয়ে কী করবো?

–লোকজনে বাকি দুইটা দেখে জানবে যে তোমার দাঁত ছিল। অপকর্মের জন্য ত্রিশটা গেছে। তিনদিনের মধ্যে যদি টাকা ফেরত না আনো তো চতুর্থ দিন তোমার ভাগ্য নির্ধারণ করা হবে। আমার জীবন, সংসার, ভবিষ্যত নিয়ে তামাশা করার আর কোনো সুযোগ দিবো না। একই কাহিনী বারবার টাকা, টাকা আর টাকা। যেন টাকা পাওনা আছে আর কী। সোজা আঙুলে ঘি না উঠলে আঙুল একটু বাঁকা করবো। একলাফে এক হাজার। এরপর হয়তো দশ হাজার। শরমও করে না পরের টাকা খেতে।

–শরম করবে কেন? তারা কী চুরি করে নেয় নাকি? মেয়ে রোজগার করে বাবা মাকে দেয়।

–তোমার যে বিয়ে হয়ে গেছে সে কথা মনে আছে? তোমার সবই যে এখন আমার এটা বোঝে না? নাকি তুমি আমার সাথে লিভ টুগেদার করো?

–বিয়ের পর যে আমেরিকা নিয়া আসবা এমন তো বিয়ের আগে কথা ছিল না। মা তো সে রকমই সেদিন বললো। তুমি শর্ত ভঙ্গ করেছো।

–বিয়ের সময় আমেরিকা আসার কোনো ব্যাপার ছিল নাকি? তাহলে তোমার সবকিছু নির্ধারিত হয় বাংলাদেশের ঐ তথাকথিত হেড অফিস থেকে? ঐ অপশক্তির জোরে তুমি আমার সংসারটা তছনছ করছো? আমার শান্তি নষ্ট করবে? বিয়ের পর তোমাকে আমেরিকা নিয়ে এসেছি সে জন্য তাদেরকে টাকা পাঠিয়ে শর্ত ভঙ্গের ক্ষতি পূরণ দিচ্ছো? আসল কাহিনী তাহলে সেটা? সেখান থেকেই চাকরি করার তাগাদা আসে? টাকা পাঠানোর হুকুমও তাহলে ঐখান থেকে আসে? ওখানে বসে সবকিছু রিমোট কন্ট্রোলে নিয়ন্ত্রণ করে? আসল কাহিনী তাহলে এই? মুখ বাঁকা করে বলেই যাচ্ছে জয়দেব।

নির্মল বাবুকে ফোন করে জয়দেব। তাকে বাসায় আসতে বলে। পরিবারিক এসব সমস্যা নিয়ে জয়দেব এর আগেও নির্মল বাবুর সাথে আলোচনা করেছে। একান্ত পারিবারিক বিষয় নিয়ে অন্যের সাথে আলোচনা করা লজ্জাজনক জয়দেব তা জানে কিন্তু পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে তখন আর করার কিছু থাকে না। একান্ত পারিবারিক বিষয় একজন দু'জন করে এক সময় সবাই জানে।

আপন মনে রান্না করে যাচ্ছে মধুমিতা। তাকে চিন্তিত বা বিচলিত কোনোটাই মনে হয় না। কারণ সে যা করেছে, তা তার জ্ঞাতসারেই করেছে। গালে হাত দিয়ে, দেয়ালের দিকে তাকিয়ে খানিকক্ষণ ভাবলো জয়দেব। তেমন কোনো সমাধান সে বের করতে পারছে না। মধুমিতা দিনদিন তার

নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। ছেলেমেয়েগুলোও কেমন যেন একরোখা হয়ে যাচ্ছে। অথচ এমন হবার কথা ছিল না। অর্ধযুগ সীমাহীন কষ্ট স্বীকার করার পর জয়দেব তার পরিবারকে এখানে আনতে পেরেছে। মধুমিতা এমন ছিল না। এখানে আসার কিছুদিন পর থেকে সে বদলে যেতে থাকে। বদলাতে বদলাতে একবারে শেষ সিঁড়িতে নেমে এসেছে মধুমিতা। মাঝে একটি অপশক্তি লাভবান হবার নিমিত্তে শান্তি হরণের কাজে লিপ্ত রয়েছে জয়দেব তা জানে, তাদেরকে চিনে সে কিন্তু কিছু করতে পারে না। ভাবনায় তার ছেদ পড়ে দরজায় কলিং বেলের শব্দে।

জয়দেব উঠে দরজা খুলে দেয়। নির্মল বাবু ঘরে প্রবেশ করেন। শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর জয়দেব বলে–যে কারণে আপনাকে ডেকেছি নির্মলদা।

কোনো কথা না বলে নির্মল বাবু শুকনো মুখে জয়দেবের দিকে তাকান। অনুমান করতে পারেন যে কিছু একটা ঘটেছে। ঘরে প্রবেশ করেই একটা নিরবতা লক্ষ করেছেন।

–বলুন। আমি কার কী করতে পারি। বললেন নির্মল বাবু।

–ওনাকে ডাকুন। তার সামনে থাকা দরকার। তা না হলে সে অস্বীকার করবে আমি তো কিছুই জানি না। জয়দেব বললো।

–বৌদিকে ডাকা কী আমার ঠিক হবে? আপনিই বরং ডাকুন। আপনাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আমি তৃতীয় ব্যক্তি।

–বাধ্য না হলে আপনাকে ডাকতাম না নির্মলদা। আমি জানি আপনি অস্বস্তি বোধ করছেন। আপনজন মনে করেই আপনাকে ডাকা। যদি কোনো সমাধান করা যায়। সে তো আমার কোনো কথাই শোনে না। শুনলে আর আপনাকে ডাকতে হয় কেন? তার যা ইচ্ছে হয় সে তা-ই করে যাচ্ছে।

তর্জন-গর্জন ভাব নিয়ে মধুমিতা সামনে এসে একটা চেয়ার নিয়ে বসলো।

–আমাকে ডাকতে হবে না নির্মলদা, আমি এমনিতেই এসে গেছি। আপনাকে ডেকেছে আমার নামে বিচার দেওয়ার জন্য। করুন। বন্ধুর বিচার করুন। বন্ধুর বিরুদ্ধে আবার রায় দিবেন না যেন। ব্যাঙ্গ করে বলছে মধুমিতা।

–বিব্রতবোধ করছেন নির্মল বাবু। কী বলবেন বুঝে উঠতে পারছেন না।

–চুপ করো, তা না হলে উঠ এখান থেকে। ধমক দিলো জয়দেব।

–শোনেন নির্মলদা, আমাদের সকল সমস্যার কথাই তো আপনি জানেন। নিজেরা যখন আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করতে না পারি তখনই কেবল আপনাকে ডাকতে হয়। ইদানীং সে আমার কোনো কথার পাত্তা দিচ্ছে না। পুরনো কথা তুলতে চাই না। তাতে সমস্যা কমবে না। দেশে তার বাপ-মাকে টাকা পয়সা পাঠানো নিয়ে এর আগে বহুবার শান্তি নষ্ট হয়েছে। তাকে আমি যত নিষেধ করছি, সে আমার কোনো কথা কানেই তোলে না। আমাকে সে এখন আর পারতে হিসেবেই ধরে না। আজ সে তার মা-বাবার জন্য এক হাজার ডলার পাঠিয়ে দিয়েছে। আমি তাকে আলটিমেটাম দিয়েছি তিনদিনের মধ্যে টাকা ফেরত আনার জন্য। যদি না আনে তাহলে চতুর্থ দিন আমি সিদ্ধান্ত নিবো আমি কী করবো। একদমে বলে গেল জয়দেব।

–সে কথা বৌদিকে বললেই তো হয়। আমাকে আর ডাকা কেন? উত্তর দিলো জয়দেব।

–সে কথা তাকে বলেছি। আমার কথা সে পাত্তা দেয় না বরং আমাকে উল্টা ধমক দেয়। সে জন্যই আপনাকে সাক্ষী রেখে সামনে বলা যে আমি যা বলেছি অত্যন্ত সিরিয়াসলি বলেছি এবং আমার কথার কোনো নড়চড় হবে না। বারবার একই অশান্তি আমার আর ভালো লাগে না। এখন জিজ্ঞাসা করুন সে কী করবে।

নির্মল বাবু মধুমিতার চোখের দিকে তাকালেন। কোনো কথা বললেন না।

–যে টাকা পাঠিয়েছি, সে টাকা ফেরত আনবো কেন? আমি রোজগার করি, আমি পাঠাই। তার ঘরসংসার সব ঠিক রেখে কাজ করি। তার সংসারে খরচ করি–আমার মা-বাবাকে মাঝে মাঝে কিছু পাঠাই, সেটা নিয়ে এত জ্বলে কেন? সে তার বাবা মার জন্য পাঠায় না? আপনি পাঠান না? অন্যেরা গোপনে পাঠায় না? কারো বেলা যদি কোনো দোষ না হয় তবে আমার বেলা এত দোষ কেন? আমার বেলা কেন এত বিচার ব্যবস্থা? আমি চোর না ডাকাত? স্বামীর দিকে তাকিয়ে রুক্ষ মেজাজে বলছে মধুমিতা।

নির্মল বাবু একবার মধুমিতার চোখের দিকে, একবার জয়দেবের চোখের দিকে তাকাচ্ছে। কোনো কথা বলছেন না। কী বলবে, বুঝতে পারছেন না।

অগ্নিমুর্তি শব্দটি বাংলায় কখন সংযোজিত হয়েছিল বলা মুশকিল। মধুমিতা আস্তে আস্তে সে অগ্নিমুর্তি ধারণ করছে। বন্ধুর সামনে স্বামী তাকে অপমান করছে এবং তার বাবা-মায়ের সম্পর্কে কটুক্তি করছে। অসহ্য। শুধু অসহ্য নয়, সে সাথে আরো অনেক কিছু।

–আপনি তো কিছুই বলছেন না নির্মল দা। তাহলে আপনাকে ডাকলাম কেন? বললো জয়দেব।

–আমি যে কী বলবো সেটাই ভেবে পাচ্ছি না। বৌদি যা বললো সেটা আপনি শুনেছেন, আপনি যা বলেছেন সেটা বৌদি শুনেছে। আপনারা দু'জনে যা বলেছেন সেটা আমি শুনেছি। আমার বিবেচনা হলো এই যে, যা কিছু করবেন সেটা দু'জনের সম্মতিতে করা উচিত। সংঘাত, সংঘর্ষ বা শান্তি বিনষ্ট হতে পারে এমন কাজ কারোই করা উচিত নয়। শান্তি যদি একবার ফেরারি হয়ে যায় তাহলে জীবন খুবই যন্ত্রণাদায়ক হয়ে উঠবে। তাহলে কেউ-ই সুখী হতে পারবেন না।

–আপনার বিচার যদি নিরপেক্ষ হয়ে থাকে তাহলে সে টাকা পাঠানোর সময় আমার অনুমতির দরকার না হলে, আমি টাকা পাঠানোর সময় তার অনুমতি লাগবে কেন? তার বাবা মার টাকার দরকার হলে, আমার বাবা-মার টাকার দরকার নেই কেন? রুম্নবেলের মা, মুনমুনের মা মাঝে মাঝেই গোপনে তার মা-বাবার জন্য টাকা পাঠায়। রূপালি বৌদি গোপনে এবং প্রকাশ্যে প্রতিমাসেই তার মা-বাবার জন্য টাকা পাঠায়। আমি তো প্রতিমাসে পাঠাই না। মাঝে মাঝে পাঠাই। আমাকে যদি আর ভালো না লাগে বলুক, আমার পথ আমি দেখবো। বললো মধুমিতা।

–শুনলেন তো দাদা? কতদুর অগ্রসর হয়েছে এবার দেখলেন তো? ওকে জিজ্ঞাসা করুন্ন অন্যলোক গোপনে বা প্রকাশ্যে দেশে টাকা পাঠায় সেটা ও জানে কী করে? ও কী তাদের দালাল নাকি কমিশন এজেন্ট? বাইরের কিছু স্বার্থান্বেষি লোক ওর মাথাটা খেয়েছে। ওকে আমি যতবার বোঝানোর চেষ্টা করেছি যে বাইরের সব লোক তোমার বন্ধু নয়, আমার কোনো কথাই সে কানে তোলে না মনে হয় তারা ওকে আমেরিকা এনেছে, আমি কেউ নই, আমাদের সন্তান কেউ নয়। এমন বেআক্কেল মহিলা আমি আর দেখিনি। ওকে জিজ্ঞাসা করুন্ন তো রূপালি বৌদি যা করে, ওকেও তা করতে হবে কেন? সে যে কত বড় এক ধুরন্ধর মহিলা সেটা ও এখনো টের পায়নি। স্বামীকে বানিয়ে রেখেছে ঠুঁটো জগন্নাথ। বারবার সে চরিত্রটি সামনে চলে আসছে।

–আমি আরো কয়েকজনের কাছে ঐ মহিলার কথা শুনেছি। সংসার ভাঙতে সে নাকি খুবই পারদশী। একজনের কথা আরেকজনের কাছে লাগিয়ে সে সবার কাছে ভালো থাকে। বাংলা সাহিত্যে এক অনবদ্য চরিত্র। একদিন মার্কেটে দেখা, আমাকে বলে বৌদি বাচ্চাদের এখনো আনছেন না কেন? দেশে মহিলারা একা একা থেকে কী করে, না করে তার ঠিক আছে? কয়েকমাস পর আবার একই মার্কেটে দেখা। বৌ বাচ্চার কথা জিজ্ঞাসা করতে আমি বললাম–অনেক দুর অগ্রসর হয়েছে, এখন যে কোনোদিন ভিসার ইন্টারভিউর জন্য ডাকতে পারে। আমাকে সে বলে–মহিলাদের এ দেশে না আনাই ভালো। চারদিকে যে পরিবেশ তাতে মহিলারা আর মহিলা থাকে না। আমার মুখের কাছে চলে এসেছিল যে জিজ্ঞাসা করি, আপনি কি তাহলে মহিলা নেই? জিজ্ঞেস করি করি করেও করলাম না। একটা কথা বললে সেটাকে আবার রাষ্ট্র করে দেবে। শুনেছি ঢেঁকি নাকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে, এখন তো দেখছি ঢেঁকি মঙ্গল গ্রহে গেলেও একই কাজ করবে। স্বভাব যায় না মলে–একটা কথা আছে না? যার যা স্বভাব তা সে করবেই। আমেরিকাই কি, বাংলাদেশেই বা কি? অন্যের প্ররোচনায় নিজের সংসার ধ্বংস হবে, এটা কোনো কথা হলো? বললেন নির্মল বাবু। এবার বিস্ময়ের সাথে জয়দেব ও মধুমিতা নির্মল বাবুর দিকে তাকালো। নির্মল বাবু এই ভেবে মনে মনে আনন্দিত এ কারণে যে তারা তার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনেছে। আবার বলতে শুরু করলেন তিনি–

–এখানে বাংলাদেশি কমিউনিটির অবস্থা দেখছেন না? কারো ভালো কেউ দেখতে পারে না। একজন আরেকজনের পিছনে লেগেই থাকে। একজন যদি একটা কিছু করে অন্যজন সেটা করতে হবে। তা না হলে যেন ঘুম নেই। এ নিয়ে দলাদলি, ভাগাভাগি, মামলা-মোকদ্দমা পর্যন্ত গড়ায়। অন্য কমিউনিটিতে এটা কল্পনাতীত। অন্যদের মধ্যে কোন্দল থাকলেও দেশের স্বার্থে তারা এক সুরে কথা বলে। আর বাঙালি? বাঙালিদের দেশ যেন একটা নয়। একাধিক। আমাকে যখন ডেকেছেন–আমি দু'জনকেই বলবো–এমন কিছু কেউ করবেন না যাতে নিজেদের সংসার চূর্ণ-বিচুর্ণ হয়। নিজেরা

ছিন্ন-ভিন্ন হলে অন্যেরা কিন্তু সাহায্য করবে না বরং হাততালি দিবে। কিছুসংখ্যক লোকের নিঃশ্বাস সাপের নিঃশ্বাসের চেয়ে বিষাক্ত। এরা লাগিয়ে দিয়ে তামাশা দেখে। পরিস্থিতি বুঝে কেটে পড়ে। রুবেলের মা বলুন আর মুনমুনের মা বলুন, যদি একই গুরুর শিষ্য হয়ে থাকে তাহলে একই ধরনের কাজ করবে, তাতে তো অবাক হওয়ার কিছু নেই। নিজেরা চলতে হবে নিজেদের মতো করে। এরা ছাড়া চলার মতো কী কোনো বাংলাদেশি লোক এখানে নেই। যারা ভয়ংকর চরিত্রের অধিকারী তাদের বর্জন করলেই তো হয়।

যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালেন নির্মল বাবু।

–বসুন তো। না খেয়ে যাবেন কোথায়? এখন একবার ফাইনাল জিজ্ঞাসা করুন আমার কথা সে শুনেছে কিনা। নির্মল বাবুকে বললো জয়দেব।

নির্মল বাবু মধুমিতার দিকে তাকালেন। মুখে কোনো কথা বললেন না। একটু নমনীয় হলো মধুমিতা। সে কিছু বলতে চায়।

–কিছু বলবেন বৌদি?

–যে টাকা পাঠিয়ে দিয়েছি, সে টাকা ফেরত আনবো কী করে? আমাকে যদি এখানে না মানায়, আমাকে আর পছন্দ না হয় তাহলে ঢাকা পাঠিয়ে দিতে বলেন। সেখানে গার্মেন্টসে কাজ করে খাবো।

–ওর কপালে সেটাই আছে। ওটাই ওকে টানে। যাকে যেখানে মানায়। স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললো জয়দেব।

কোনো কথা না বলে মুখ ভার করে মধুমিতা রান্নাঘরে চলে গেল।

স্বামী ও নির্মল বাবুর জন্য ভাত বেড়ে মধুমিতা ডাক দিলো–দাদা আসেন।

–এলেই খেতে হবে কোনো মানে আছে? কোনো উপকার করতে পারি না। এলেই এক পেট খেয়ে যাই। ওরা খাবে না?

–এই যে এতগুলো কথা বললেন এটা উপকার নয়? তিনদিনের মধ্যে যদি টাকা ফেরত না আনে তারপর যে অঘটন ঘটবে সেটা কে সামাল দিবে? আপনি ছাড়া আমাদের আপনজন আছে কে? আমার বিরুদ্ধে আপনার কাছে যদি কিছু বলার থাকে তাহলে নির্দ্বিধায় বলতে পারে। একতরফা তো কোনো বিচার হয় না। সেটা হয় বিচারের নামে প্রহসন। আমি আমার স্ত্রীর বিরুদ্ধে আপনার কাছে অভিযোগ করছি, আমি কী খুব স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করছি?

–স্ত্রী না ছাই। বাসায় কাজের বুয়ারও একটা দাম থাকে। বলেই ফুঁফিয়ে কাঁদতে কাঁদতে মধুমিতা তাদের সামনে থেকে চলে গেল।

–থাক দাদা, টাকার ব্যাপারটা ভুলে যান। বেঁচে থাকে অনেক টাকা হবে। এ নিয়ে যদি কোনো অঘটন ঘটে তাহলে দুঃখের শেষ থাকবে না। খেতে খেতে বললেন নির্মল বাবু।

–দুঃখের আর দেখলেন কী? ঐ মহিলা আমার জীবনটাকে একেবারে অতিষ্ঠ করে তুলেছে। শান্তির জন্য আমি যত ত্যাগই স্বীকার করি সে সেটাকে তামাশা হিসেবে মনে করে। ঘটনা তো এখানেই শেষ নয়। এবার দেশে গেলে তথাকথিত শ্বশুরবাড়ির লোকজনও ধরবো। তারা এখানে টাকা পাওনা আছে কিনা। তাদের উস্কানিতেই তো এতটা বেপরোয়া হয়ে গেছে। ওর সাথে আমার সাথে লাগিয়ে রাখতে পারলে তাদের পোয়াবারো। তারা টাকার জন্যই ইচ্ছে করে লাগিয়ে রাখে। আপনাকে বললাম না, সব কথা বলতে পারছি না। আমাকে ও তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিক বানিয়ে রেখেছে। আমেরিকা বলে কথা, কিছু করতে পারছি না। সহ্যের একটা সীমা আছে না?

–চুপ করেন তো দাদা? সব ঠিক হয়ে যাবে। বিয়ের পরে মা-বাবার বাড়ির দিকে একটু টান সব মেয়েদেরই থাকে। খেতে খেতে বললেন নির্মল বাবু।

খাওয়ার পর নির্মল বাবু চলে গেলো। ছেলেমেয়েরা খেয়ে যে যে যার যার বিছানায় শুয়ে পড়ল। জয়দেব তার বিছানা নিয়ে ফ্লোরে শুয়ে পড়ল। মধুমিতা কোনো বাধা দিলো না। এই প্রথম রাত, মধুমিতা আমেরিকা আসার পর জয়দেব আলাদা বিছানায় ঘুমালো।

ঘরের মধ্যে পাঁচজন মানুষ। দু'জন পরিণত বয়সের, তিনজন অপরিণত বয়সের কিন্তু মনে হয় এ-ঘরে কোনো মানুষ বাস করে না। সবাই রোবটের মতো চলাফেরা করছে। কেউ কারো সাথে কোনো কথা বলছে না।

আলটিমেটামের দ্বিতীয় দিন সকালে মধুমিতা কাজে বের হতে চাইলে জয়দেব মেয়েকে ডেকে বললো–তোমার মাকে বলো যদি আমার কথা অমান্য করে কাজে যায় তাহলে এ-ঘরের দরজা তার চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে যাবে। সে আর এ ঘরে প্রবেশ করতে পারবে না।

–শুনেছো বাবা কী বলেছে? খুব জোরে বলে প্রিয়ন্তি ভাইদের নিয়ে স্কুলে চলে গেল।
রাগত দৃষ্টিতে মধুমিতা মেয়ের দিকে একবার তাকাল। মুখে কোনো কথা বললো না।

জয়দেব কাজে চলে গেল। মধুমিতা কঠিন একটি সমস্যায় পড়লো ে। বামপাশের কপালের উপর দিকে চুলকাচ্ছে তার। যা সমুহ বিপদের লক্ষণ। শরীর ভালো নেই, আজ কাজে যেতে পারবে না বলে মধুমিতা সুপারভাইজারকে ফোন করলো। যদিও এ কথা বলতে তার খুব কষ্ট হয়েছে।

রূপালিকে ফোন করলো মধুমিতা। রূপালি ঘরেই ছিল।

–হ্যালো বৌদি, রূপালি বলছি।

–হ্যাঁ বুঝতে পারছি, বলুন। কী খবর?

–হাতে কোনো কাজ না থাকলে যদি একটু আসতে পারেন।

–হাতে কোনো কাজ নেই এখন কিন্তু দুপুর দুটো থেকে কাজ। এখন বের হলে সব সামাল দিতে পারবো না। ফোনেই বলুন। খুব কী জরুরি?

–আমার তো সর্বনাশ হতে চলেছে বৌদি। প্রিয়ন্তির বাবা আমাকে আজ থেকে কাজে যেতে দিচ্ছে না। ঐদিকে আপনার কথা ধরে দেশে একহাজার ডলার পাঠিয়ে তো আরো বিপদে পড়েছি।

–আমাকে কোনো কিছুতে দোষ দিবেন না যেন ভাই। আমাকে কোনো কিছুর মধ্যে টানবেন না। টাকা পাঠিয়েছেন আপনার বাবা-মায়ের জন্য, আমার বাবা-মার জন্য তো নয়। তাহলে আমাকে টানছেন কেন?

–আপনাকে টানছি না, এখন কী করবো সেটার পরামর্শ চাই। মধুমিতার গলা শুকিয়ে আসছে। যে যেন আর কথা বলতে পারছে না।

–চাকরিতে যেতে নিষেধ করেছে কেন? রহস্যময় কণ্ঠস্বর রূপালির।

–আমাকে আর চাকরি করতে দিবে না। দেশে যে একহাজার ডলার পাঠিয়েছি তা তিনদিনের মধ্যে ফেরত এনে দিতে বলেছে। আজ দ্বিতীয় দিন। তা না হলে চতুর্থ দিন কঠিন সিদ্ধান্ত নিবে। আপনি কী আমাকে এক হাজার ডলার ধার দিবেন? আমি আপাতত সামাল দিই। তা না হলে একরোখা মানুষ, কী করে বসে কে জানে।

–আমি এক হাজার ডলার কোথায় পাব? আমার কাছে এত ডলার নেই। নিজেদের নুন আনতে পান্তা ফুরায়। স্বামী যদি না চায় চাকরি করবেন না।

–চাকরি তো গেলই, এখন এক হাজার ডলার সামাল দিবো কী করে? আপনাদের দাদার থেকে নিয়ে মিলিয়ে আমাকে দিন না এক হাজার ডলার। তা না হলে কী করে বসে কে জানে।

–কচু করবে। পুরুষ মানুষকে বশ করা শিখেননি? সুব্রতের বাবা এমন কথা বললে মুখে স্কচট্যাপ এঁটে দিতাম না? আমি যদি বলি বসো, বসে। আমি যদি বলি দাঁড়াও, তাহলে দাঁড়ায়। আমার সাথে এত পাওয়ার চলে না। এটা আমেরিকা। বুঝলেন?

–আপনার ব্যাপারে ঠিক আছে, এখন আমার ব্যাপারে কী করবো সেটা বলুন।

–কী করবেন আবার? চুপ করে পড়ে থাকুন। চাকরি গেলে, চাকরি পাবেন। স্বামী যদি সব খরচ চালাতে পারে তবে স্ত্রীর কষ্ট করে চাকরি করার দরকার কী?

–আজকে আপনাকে এত অচেনা লাগছে কেন রূপালি বৌদি? শুকনো গলায় বললো মধুমিতা।

–ঢং। আপনার যে আজ ঢং বেড়েছে। সে জন্য আমাকে এমন অচেনা লাগছে। রাখি এখন। কাজ আছে। পরে কথা হবে। ঝাঁঝালো গলায় বলে রূপালি ফোন রেখে দিলো। মধুমিতা আর কোনো কথা বলতে পারল না। জগতে কে তুমি, কে তোমার-এমন একটি কবিতার অস্পষ্ট চরণ মনে পড়ছে মধুমিতার। কবে পড়েছে, কোথায় পড়েছে, আজ তার মনে আসে না। হঠাৎ করেই কবিদের প্রতি তার একটা দরদ জমে গেল। কবিরা কী সুন্দর করে মানুষের ভবিষ্যতের কষ্টগুলোর কথা বলে দিতে পারে। অনেকটা জ্যোতিষীদের মতো। একজন কবি মনের দিক থেকে কত বড়, অথচ কী সাধারণ তাদের জীবনযাপন। কত সরল, কত অনাড়ম্বর। বাইরের থেকে তা কেউ বোঝে না।

সিনেমার পর্দায় একই দৃশ্য বারবার রিপেস্ল করে যেমন করে দেখায় রূপালির চেহারাটা বার বার তার সামনে তেমন করে ভেসে উঠছে। মুনমুনের মা, রন্নবেলের মার কথা মনে পড়ছে মধুমিতার। তাদেরকে ফোন করে এ বিপদে সাহায্য চাইবে কিনা ভাবছে সে। নাকি তারাও বিপদের দিনে রূপালির মতো মুখ ফিরিয়ে নিবে? তবে কী কাজটা বাড়াবাড়ি হয়ে গেল? নিজেকে এত একা একা লাগছে কেন তার? পেটের সন্তানেরা পর্যন্ত অমর্যাদা করে কথা বলে। আর যেন কিছু ভাবতে পারছে না মধুমিতা। এটা তো আমেরিকা কিন্তু শান্তি জিনিসটা এমন অধরা কেন এখানে? এখানে না শান্তির খনি থাকার কথা?

বিকালে বাসায় ফিরে জয়দেব ছেলেমেয়েদের সাথে কথা বললো, এক সাথে খাওয়া-দাওয়া করলো। স্ত্রীর সাথে কোনো কথা বললো না। মধুমিতা রোবট রমণীর মতো সব কাজ করে যাচ্ছে। মুখ তার মলিন, বিষাদের ছায়া মুখাবয়বে। ছেলেমেয়েরা যার যার বিছানায় শুয়ে পড়লো।

স্ত্রী আসার আগেই বিছানা থেকে বালিশ-কম্বল নিয়ে জয়দেব গতরাতের মতো ফ্লোরে বিছানা করে শুয়ে পড়লো। তার মধ্যে কোনো ভাবাবেগ নেই। রাগ- ক্ষোভের কোনো বহিঃপ্রকাশ নেই। মধুমিতা যে তার স্ত্রী তার মধ্যে যেন সে রকম কোনো অনুভূতিই নেই।

মধুমিতা গতকালের চেয়ে আজ আরো বেশি চিন্তামগ্ন হয়ে পড়েছে। একবার ইচ্ছে করে স্বামীর কাছে গিয়ে ফ্লোরে শোবে, আবার ইচ্ছে করে তাকে বিছানায় ডেকে নিয়ে আসবে, আবার ইচ্ছে করে স্বামীর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিবে। আর কখনো এমন হবে না। দু'দিন কাজে যাওয়া হয়নি। আর দু'একদিন না গেলে কাজটা থাকবে না। কোনোটাই করা হয় না মধুমিতার। স্বামীকে ভয়, কৃতকর্মের অনুশোচনা, বন্ধুর কাছে সব বলে দিয়ে অপমান-সব মিলিয়ে একটি কঠিন দুঃসময় তার। গতরাতের মতো একা বিছানায় ঘুমিয়ে যায় মধুমিতা।

৬

আলটিমেটামের তৃতীয় দিন প্রায় একই রকম চলে সবকিছু গত দু'দিনের মতো। রোবটগুলো মানুষ হয় না কিন্তু মানুষগুলো মাঝে মাঝে রোবট হয়ে যায়। গত তিনদিন এ ঘরটাতে যেন কোনো মানুষ ছিল না। শূন্য দৃষ্টিতে একজন আর একজনের চোখের দিকে তাকিয়েছে। তারা যেন পরস্পর অচেনা, ভিন গ্রহের মানুষ।

চতুর্থ দিন সকাল বেলা। তিনদিন পার হয়ে গেছে মধুমিতা ডলার ফেরত আনেনি বা গত তিনদিনে এ বিষয়ে কোনো কথাও বলেনি। জয়দেবের যা বলার তা তো সে নির্মল বাবুর সামনে বলেই দিয়েছে। সে-ও আর এ ব্যাপারে স্ত্রীকে কিছু বলেনি।

আজ শনিবার। ছেলেমেয়েদের স্কুল বন্ধ। ঘুম থেকে উঠার পরই মধুমিতা বিমর্ষ। মনের মাঝে একটি ভয় ভয় কাজ করছে তার। স্বামী কখন যেন কী বলে বসে। সবাইকে সকালের নাস্তা দিলো সে। অরুচি নিয়ে নিজেও খেলো। আজকেও যদি কাজে ফিরে যেতে পারে তাহলে কাজটা থাকে।

ভয়ে ভয়ে মধুমিতা স্বামীকে জিজ্ঞাসা করলো-আমি কী আসলেই আর কাজে যাব না?
গর্জে উঠলো জয়দেব-বললাম তো না। টাকা ফেরত এনেছো?

-কী করে ফেরত আনবো? এখনো তো টাকা পায়নি। পেলে আবার ফেরত পাঠিয়ে দিতে বলবো। কাজে যাই? কাজ করে সব শোধ করে দিবো। এমন সুন্দর কাজটা গেলে আর পাবো? মুখ দিয়ে মধুমিতার যেন কথা বের হচ্ছে না। গলা তার শুকনো, চাহনিতে রাগ ভাব নেই।

-এসব নরম কথায় কোনো কাজ হবে না। শয়তানকে বিশ্বাস নেই। তর্জনি নাড়তে নাড়তে বললো জয়দেব।

-তুমি শয়তান। তোমার চৌদ্দগোষ্ঠী শয়তান। জোরে জোরে বললো মধুমিতা। হঠাৎই যেন গর্জে উঠলো সে ।

সোফা থেকে উঠে জয়দেব ডানহাতে মধুমিতার গালে আচ্ছা করে একটা থাপ্পড় মারলো-আমার চৌদ্দগোষ্ঠী শয়তান? মিনমিন করে কথা বলি কারণে গায়ে লাগে না তোমার? নিজেকে সামনে রাখতে পারছে না জয়। আরো একবার সে হাত তুললো কিন্তু থাপ্পড় মারলো না।

ভেউ ভেউ করে কেঁদে দিলো মধুমিতা। ছেলেমেয়েরা দৌড়ে এলো। তারা থাপ্পড়ের শব্দ শুনেছে।

–রাখ শয়তানের বাচ্চা তোকে জেলের ভাত খাওয়াবো।

মধুমিতা ফোনের কাছে গেল। হ্যান্ডসেট হাতে নিয়ে পুলিশ কল করলো। জয়দেব সব দেখছে কিন্তু কোনো বাধা দিচ্ছে না। কারণ বাধা দিয়ে কোনো লাভ নেই। মধুমিতা পুলিশ কল করতে চাইলে যে কোনো সময়ই করতে পারবে।

–তোমার নির্মল কাকাকে ফোন করতো প্রিয়ন্তি। এখনই বাসায় আসতে বলো। আমি রেডি হচ্ছি। এখনই পুলিশ আসবে। জয়দেব জামা-কাপড় পরতে আরম্ভ করলো।

প্রিয়ন্তি নির্মল বাবুকে ফোন করলো। জয়ন্ত ও পড়ন্ত যেন কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না। তারা ভ্যাবাচেকার মতো একবার বাবার মুখের দিকে, একবার মায়ের মুখের দিকে তাকাচ্ছে। একটু পরেই যে কী ঘটতে যাচ্ছে তারা হয়তো তা কল্পনাও করতে পারছে না।

–ভাইদের নিয়ে কয়েকটা দিন সাবধানে থেকো মা, আমি ফিরে এসে যা করার করবো। বলেই জয়দেব ধপাস করে সোফায় বসে পড়ল।

–তুমি কোথায় যাবে? কৌতুহল নিয়ে জিজ্ঞাসা করলো প্রিয়ন্তি।

–একটু পরে পুলিশ আমাকে নিয়ে যাবে। আলমারিতে টাকা আছে, যা লাগে বাজার করবে। তোমার নির্মল কাকা সাহায্য করবে।

প্রিয়ন্তি যেন বাবার কথা বিশ্বাস করতে পারছে না। বাংলাদেশে মানুষ খুন হলে পুলিশে খবর দিলেও আসতে কয়েক ঘণ্টা লাগে। কখনো কখনো কয়েকদিন লেগে যায়। আবার কখনো কখনো পুলিশ আসেই না। থানায় গিয়ে টাকা দিয়ে নিহতের পরিবাররা পুলিশ আনে।

–দরজায় মৃদু টোকা শোনা গেল।

ণবং,ঃযব ফড়ড়ৎ রং ড়ঢ়বহ. জয়দেব উঠে দরজা খুলে দিলো। সে ভেবেছিলো পুলিশ এসেছে। দরজা খুলে দেখে পুলিশ নয়, নির্মল বাবু। উসকো খুসকো চেহারা তার। খুব ব্যস্তহয়ে সে এসেছে। একেবারেই জরম্নরি ফোন। অন্য সময় জয়দেব তাকে ফোন করে, আজ তার মেয়ে ফোন করে এখনই আসতে বলেছে।

–এত সকাল বেলাই ডাকাডাকি কেন? উদভ্রান্তের মতো প্রশ্ন করলো নির্মল বাবু।

–যাক, এসে পড়েছেন ভালোই হলো। একটু পরেই পুলিশ আসবে, আমাকে ধরে নিয়ে যাবে। এই নিন গাড়ির চাবি, মালিককে বুঝিয়ে দিবেন। আমি না আসা পর্যন্ত ওদের দিকে খেয়াল রাখবেন। এসে যা করার করবো। একদমে সবগুলো কথা বলে ফেললো জয়দেব।

–আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। পুলিশ আসবে কেন, আপনাকে ধরে নিবে কেন? অবিশ্বাসের সুরে বললো নির্মল বাবু।

–আলটিমেটামের আজ চতুর্থ দিন। ও টাকা ফেরত আনেনি, উল্টো আমাকে গালমন্দ করে তাই গালে একটা বসিয়ে দিয়েছি। ও পুলিশ কল করেছে।

–হায় ঈশ্বর। একটা ঘটনা থেকে কতগুলো ঘটনা ঘটলো। আপনাকে বলে গেলাম আপনি টাকার ব্যাপারটা ভুলে যান দাদা। এখন কত টাকা নামবে? সমাজে মান-সম্মান থাকবে কিছু? আর বৌদিও বা কেমন? পুলিশে খবর না দিয়ে আমাকে তো খবর দিতে পারতেন? মানুষ রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে রাগই এক সময় মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করে। আমি তো সব সময়ই আপনাদের পাশে আছি।

–আপনাকে খবর দিলে কী হতো? আপনি তো আর পুলিশ না। বিচার করলে তো বন্ধুর পক্ষেই করবেন। চোখ মুছতে মুছতে বললো মধুমিতা।

–কতটা সর্বনাশ হয়েছে আপনি হয়তো এখন কল্পনাও করতে পারছেন না। আচ্ছা ঠিক আছে, যা হবার হয়ে গেছে। আমি যখন এসে গেছি, দেখি কী করা যায়। পুলিশ এলে আপনি কী একটা মিথ্যা কথা বলতে পারবেন বৌদি? জয়দেব আপনাকে আঘাত করেনি, শুধু মন্দ কথা বলেছে? তাই পুলিশ ডেকেছেন। কথা শেষ করতে পারলো না নির্মল বাবু। দরজায় টোকা পড়লো।

–ণবং,ঃযব ফড়ড়ৎ রং ড়ঢ়বহ. জয়দেব দরজা খুলে দিলো।

–আঙ্কেলরা, তোমরা ভেতরের ঘরে যাও। আমি দেখছি। নির্মল বাবু বললো। দু'জন পুলিশ ঘরে প্রবেশ করলো।

–ঝড়সবড়হব পধষষবফ ঃযব ঢ়ড়ষরপব? পুলিশ প্রশ্ন করলো।

–ণবং. জয়দেব জবাব দিলো।

–ডযড় উরফ? উরফ ংড়সবঃযরহমং যধঢ়ঢ়বহ?? অন্য একজন পুলিশ প্রশ্ন করলো।
– ঝযব পধষষবফ ঃযব ঢ়ড়ষরপব. ও যরঃ যবৎ.
– ডযড় রং ঃযরং ষধফু? পুলিশ যেন বিষয়টি সিরিয়াস হিসেবে নিচ্ছে না।
–ঝযব ধিং সু রিভব. জয়দেব উত্তর দিলো।
–ঘড়া? ঘড়া ংযব রং হড়ঃ ুড়ঁৎ রিভব? ডযু ফরফ ুড়ঁ যরঃ যবৎ? বললো একজন পুলিশ।
–খবঃ্ং মড়. ও রিষষ বীঢ়ষধরহ ঃযব ংরঃঁধঃরড়হ রহ ঈড়ঁৎঃ. জয়দেব বললো।
–অৎব ুড়ঁ ৎবধফু ঃড় মড়? পুলিশ প্রশ্ন করলো জয়দেবকে।
–ণবং,ও ধস. দৃঢ়তার সাথে জবাব দিলো জয়দেব।
–এড়ড়ফ,ৎবং্ মড়ড়ফ. জয়দেবের দিকে তাকিয়ে পুলিশ বললো। নির্মল বাবু নিশ্চুপ ।

মধুমিতাকে কোনো কথা বলতে না দিয়ে জয়দেবই পুলিশের সাথে সব কথা বলছে। পুলিশ যখন এসেই পড়েছে তারা কেস একটি লিখবে এবং টানাহেচড়া কিছুটা হলেও করবে। জয়দেব ছেলেমেয়েদের কথা ভেবে বেশিক্ষণ ঘরে থাকতে চাইলো না। মধুমিতা জড়োসড়ো হয়ে এক কোণায় বসে আছে।

জয়দেব দ্রুত পুলিশের সাথে চলে গেল। ডুকরে কেঁদে উঠলো মধুমিতা। এতক্ষণে সে বুঝতে পেরেছে একটা কিছু হয়েছে। নির্মল বাবু নির্বিকার দাঁড়িয়ে আছে। লিভিং রুমে এসে বাবাকে না দেখে প্রিয়ন্তি, জয়ন্ত ও পড়ন্ত একসাথে কেঁদে উঠলো। নির্মল বাবু পরম স্নেহে তিনজনকে কাছে টেনে নিলেন।

–আমাকে থানায় নিয়ে যাবেন নির্মলদা? কাঁদতে কাঁদতে বললো মধুমিতা।

–আপনাদের কারোই হা-হুতাশ করার তেমন কিছু নেই। সবাই শান্ত হোন। যা করার আমি করবো। তিন চারদিনের মধ্যেই দাদা ফিরে আসবে। তবে এমন মর্মান্তিক ঘটনাটি কিন্তু এড়ানো যেত বৌদি। আপনারা তো সবসময় আমাকে ডাকেন, আর এমন একটা সময় আমাকে না বলে কাজটা করে ফেললেন। আফসোসের সুরে বললেন নির্মল বাবু।

–আমি স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারিনি কল করলেই পুলিশ চলে আসবে। আমাকে নিয়ে চলেন না দাদা, হাতে পায়ে ধরে তাকে ফিরিয়ে আনি।

–এটা আমেরিকা বৌদি, বাংলাদেশ নয়। আপনার গিয়ে কোনো কাজ নেই। আপনাকে দেখলে দাদা আরো ক্ষেপে যেতে পারে। ল'ইয়ার নিয়ে আমিই যাব। আজ শনিবার কোর্ট বসবে না, কাল রোববার-কালও কোর্ট বসবে না। সোমবার কোর্ট বসবে, মঙ্গলবারের মধ্যে জামিন করে নিয়ে আসবো। তবে আমার একটা শর্ত আছে কিন্তু বলেন, মানবেন আমার কথা?

পুর্ণ দৃষ্টিতে মধুমিতা নির্মল বাবুর চোখের দিকে তাকালো।

–দাদা ফিরে না আসা পর্যন্ত এই সংসার চলবে আমার হুকুমে। কোনো অবস্থাতেই যেন আর জটিল পরিস্থিতি সৃষ্টি না হয়। মা মনি প্রিয়ন্তি, তুমি আমাকে দু'ঘণ্টা পরপর মোবাইলে ফোন করবে। কখন কী খবর হয় আমি বলবো। তোমাদের কারো কিছু করণীয় নেই। যা করার আমিই করবো। ভুলেও এ ব্যাপারে কারো সাথে কোনো আলাপ করবে না। মনে করো, কিছুই ঘটেনি। সবকিছু স্বাভাবিক আছে। আমি যাই। ল'ইয়ার নিয়ে থানায় যাব। দু'ঘণ্টা পর তুমি আমাকে ফোন করবে। ঠিক আছে? কৃত্রিম শাসনের সাথে বললেন নির্মল বাবু।

প্রিয়ন্তি মাথা কাৎ করে সায় দিলো। ছোট দু'ভাই তাকে ধরে রেখেছে তারা এখানো কাঁদছে। মধুমিতা নির্মল বাবুর দিকে অপলক তাকিয়ে আছে।

নির্মল বাবু চলে যাবার পর প্রিয়ন্তি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো-তোমার জন্যই সব গন্ডগোল। তুমিই সব শয়তানির মুল। দেখ, বাবা বের হয়ে এসে তোমাকে দেশে পাঠিয়ে দিবে। আঙ্গুল নেড়ে নেড় প্রিয়ন্তি বললো তার মাকে।

–চুপ কর বজ্জাত মাইয়া। বাপের হয়ে দালালি করা হচ্ছে? এক থাপ্পড়ে গালের সব দাঁত ফেলে দিবো। ধমকের সাথে বললো মধুমিতা।

–থাপ্পড় মেরেই দেখ না, আমিও পুলিশ কল করবো। দেশে কতগুলো শয়তান থাকে, কেবল টাকা আর টাকা। টাকা ছাড়া কিছু বোঝে না। বললো প্রিয়ন্তি। দু' ভাইয়ের হাত ধরে সে টান

দিলো–আয় জয়ন্ত, পড়ন্ত আমরা ঠাকুরের ছবির সামনে বসে প্রার্থনা করি বাবা যেন তাড়াতাড়ি চলে আসে। থাকো তুমি শয়তান বুড়ি।

ফুটো বেলুনের মতো চুপসে যায় মধুমিতা। আবার পুলিশ! বাবার জন্য সন্তানদের মন কাঁদবে এটা আর আশ্চর্যের কী!

তিন ভাইবোন হাতজোর করে দেয়ালে টানানো বিভিন্ন ঠাকুরের ছবির সামনে বসে আছে। একটু পরে মধুমিতাও গিয়ে ছেলেমেয়েদের পিছনে হাত জোর করে বসলো।

খানিকক্ষণ পর ছেলেমেয়েরা উঠে গেলো। ডুকরে কেঁদে উঠলো মধুমিতা–ঠাকুর এত বড় ভুল কী করে হলো? কোথা থেকে এত রাগ এলো আমার। উনি যেন ভালোয় ভালোয় ফিরে আসে। আমার কপালে যা আছে হবে। আবার ডুকরে কেঁদে উঠলো মধুমিতা। ফ্লোরে কপাল ঠেকালো সে।

প্রিয়ন্তি এসে মাকে ধমক দিলো–এখন ঠাকুর, ঠাকুর করছো কেন? বাবা না তোমাকে কত বার বুঝিয়েছে? আমার বাবার কিছু হলো তোমার বাবার খবর আছে। এত খাই খাই কেন তোমার বাবার?

করুণ দৃষ্টিতে মধুমিতা মুখ তুলে মেয়ের দিকে তাকালো–তোর কাকাকে একটু ফোন করে দেখ না মা, তোর কাকা তোর বাবার কাছে গেল কিনা।

–এখনো দু'ঘণ্টা হয়নি। তোমার দরকার হলে তুমি করো। আমাকে বলছে কেন। ঝাঁঝালো গলায় বললো প্রিয়ন্তি।

–বিপদের সময় এমন করে কথা বলে না মা। মানুষই তো ভুল করে। আমি কী সবকিছু আমার মা-বাবার জন্যই করি? তোদের জন্য করি না? মা না থাকলে তোদের আদর যত্ন করবে কে?

–তোমার মতো মা আমাদের লাগবে না। আমরা একা থাকতে পারবো।

দু'ঘণ্টার আগেই ফোন বেজে উঠলো। নির্মল বাবু ল'ইয়ার নিয়ে থানায় গিয়ে জয়দেবের সাথে দেখা করে এসেছেন। কোনো অসুবিধা নেই বলে নির্মল বাবু বাসার সবাইকে সান্ত্বনা দেন। সবাই তার কথায় ভরসা করে।

আর কোনোদিন স্ত্রীর গায়ে হাত তুলবে না এই মুচলেকা দিয়ে চতুর্থ দিন অর্থাৎ মঙ্গলবার জয়দেব জেল থেকে ছাড়া পায়। নির্মল বাবু গেটে জয়দেবের জন্য অপেক্ষা করছিল।

বের হয়ে এসে জয়দেব নির্মল বাবুর সাথে করমর্দন করে–বাসার সবাই কেমন আছে নির্মলদা?

–সবাই ভালো আছে। ওরা তিনজনেই স্কুলে গেছে। আমি বুঝিয়ে-শুনিয়ে স্কুলে পাঠিয়ে দিয়েছি। ওদেরকে বলেছি স্কুলে যাও, বিকেলে ফিরে এসেই বাবাকে বাসায় দেখতে পাবে।

–আজই যে মুক্তি পাব এমন নিশ্চিত হলেন কী করে? জয়দেব প্রশ্ন করলো।

–ল'ইয়ার গতকাল তা-ই বলেছে। ফরমালিটি রক্ষা না করলেই নয় তাই কোর্টে তোলা। প্রতিদিন এ জাতীয় ঘটনা শত শত ঘটছে। বাসায় ফোন করবেন?

–ওরা বললেন স্কুলে গেছে। বাসায় আর কার সাথে কথা বলবো?

–বৌদি আছে না?

–যে শয়তানের জন্য তিনদিন হাজতবাস করলাম সে শয়তানের সাথে আবার কথা কী? কয়েকদিনের মধ্যেই দেখবেন আমি কী করি।

–যা-ই বলেন দাদা বেচারী অনেক কেঁদেছে। সে যে ভুল করেছে সেটা বার বার আমার কাছে স্বীকার করেছে। কল করলেই যে পুলিশ চলে আসবে সেটা সে কল্পনাই করতে পারেনি। বাসায় গিয়ে এ নিয়ে আর কোনো প্রসঙ্গই তুলবেন না।

দু'জনে হাঁটতে হাঁটতে বাসস্টপের কাছে চলে এলো। বাস আসতে দেখা যাচ্ছে না। নির্মল বাবু ফোন করে মধুমিতাকে খবর দিলো। জয়দেব কোনো বাধা দিলো না।

–আমি এখন আপনার সাথে আপনার বাসায় যাই নির্মলদা? ওরা তো এখন কেউ বাসায় নেই।

–আমার বাসায় যেতে তো কোনো আপত্তি নেই। আমি চাই আপনি প্রথম নিজের বাসায় যান। আমিও যেতাম আপনার সাথে। গত তিনদিন কাজে যাইনি। আজ যখন এখনো সময় আছে কাজে যাই। আজ আটটা পর্যন্ত কাজ করবো। এরপর আপনি চলে আসুন না-হয় আমি চলো আসবো।

জিহ্বায় কামড় দেয় জয়দেব। –আপনার কত বড় সর্বনাশ হয়ে গেল দাদা। আমার জন্য তিনদিন কাজে যেতে পারেননি।

–আরে না। এ আর এমন কী। কারো উপকার করলে নিজের তো একটু ক্ষতি হবেই। তবুও সান্ত্বনা যে অল্পতেই সব ঝামেলা মিটে গেছে। বাদী তো বাড়াবাড়ি করেনি বরং আত্মসমর্পণ করেছে। বাদী কোর্টে গিয়ে জেরা করলে তো আরো ঝামেলা ছিল। একই কেসে কায়েস ভাইয়ের জামিন পেতে ৭ দিন লেগেছিল। কায়েস ভাইয়ের স্ত্রী তো কোর্টে উঠে সাক্ষী দিয়েছিল, কায়েস ভাই তাকে মাঝে মাঝেই গায়ে হাত তোলে। সে মামলা এখনো চলছে। সে ঝামেলাও আমাকে সামাল দিতে হয়েছে।

নিজেকে বড় অসহায় মনে হচ্ছে জয়দেবের। এ খবর ধামাচাপা থাকবে না। কারো না কারো মুখে রাষ্ট্র হয়ে যাবে।

বাসার কাছে চলে এসেছে জয়দেব ও নির্মল বাবু। নির্মল বাবু একটু পরে কাজে যাবেন তাই জয়দেবকে সাধাসাধি করেননি। তাছাড়া একা বাসায় গিয়ে সে কী করবেন। অনেকটা বাধ্য হয়েই জয়দেবকে নিজের বাসায় ফিরতে হলো।

দরজায় টোকা দিলো জয়দেব। মধুমিতা এসে দরজা খুলে দিলো। স্বামীকে দেখে তার দেহে যেন প্রাণ ফিরে এসেছে। ৩/৪ দিন সেভ না করাতে জয়দেবকে একটু উসকো খুসকো লাগছে তবে ফেরারি ফেরারি লাগছে না।

কয়েক মিনিট বিশ্রাম নিয়ে বাথরুমে ঢুকলো জয়দেব। মধুমিতা শুধু চেয়ে চেয়ে দেখছে জয়দেব কী করছে। সে ভয়ে কোনো কথা বলছে না।

স্নান করে বের হয়ে জয়দেব ডাইনিং টেবিলের পাশে ঘোরাঘুরি করছে। ক্ষিধে পেয়েছে তার। মধুমিতা এসে যে ভাত বেড়ে দিবে সাহস পাচ্ছে না।

দুর থেকে সাহস সঞ্চয় করে মধুমিতা বললো–আমি জানি আমার হাতের রান্না আর কেউ খাবে না। নির্মলদা সকালে ফোন করে বলেছে আজ প্রিয়ন্তির বাবা বাসায় আসবে। তাই মেয়েই আজ বাবার জন্য রান্না করে রেখে গেছে। প্রিয়ন্তি বলে গেছে বাবা যেন সবকিছু খায়। সুযোগ দিলে আমি শুধু ওভেনে গরম করে দিতে পারি।

চক্ষু লাল করে জয়দেব স্ত্রীর দিকে তাকালো। তার চোখ থেকে যেন আগুন ঠিকরে বের হচ্ছে। গুটিসুটি করে ঘরের এককোণায় ফ্লোরে বসে রইলো মধুমিতা।

কিছু কিছু মিথ্যাচার আছে যা লঘু পাপ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। যারা পাপ-পুণ্যের রেকর্ড কিপার তারা হয়তো লঘু পাপগুলোর দিকে বেশি নজর দেন না। প্রিয়ন্তির বয়স এখন পনের। বাঙালি মেয়ে। পনের বছরের বাঙালি মেয়ে বাবার জন্য ডাল-ভাত রান্না করতে পারবে এটা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। জয়দেব ক্ষুধার্ত। মধুমিতা বলেছে আজ মেয়ে রান্না করে রেখে গেছে। জয়দেব সত্যাসত্য নির্ণয় না করেই খেতে বসেছে। মধুমিতা যদি মিথ্যে বলেও থাকে, আপাতত তা প্রমাণের সুযোগ নেই।

আজ মঙ্গলবার। আরলি স্কুল ছিল বলে ছেলেমেয়েরা তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরে এলো। জয়দেব বিছানায় একটু গা এলিয়ে দিয়েছিল। মধুমিতা ছেলেমেয়েদের দরজা খুলে দিয়ে হাসিমুখে বললো–তোদের বাবা এসেছে।

ক্ষিপ্ত হলো প্রিয়ন্তি। –আমাদের বাবা এসেছে তো তোমার কী? বাবা, বাবা। তিনজন একসাথে বই এর ব্যাগসহ জয়দেবের গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লো।

–মেরে ফেলবি নাকি আমাকে? আমি তো এসেই গেছি। তোরা ভালো ছিলি তো? কোনো রকমে উঠে বসলো জয়দেব। পড়ন্ত তার কোলের মধ্যে শুয়ে পড়লো। প্রিয়ন্তি ও জয়ন্ত দু'পাশ থেকে বাবাকে চেপে ধরলো। মধুমিতা উঁকি দিয়ে বাপ ছেলেমেয়ের মহা মিলন দেখে দু'ফোটা অশ্রু বিসর্জন দিয়ে রান্নাঘরে চলে গেল।

দু'দিন বিশ্রামের পর জয়দেব কাজে যোগদান করলো। সে স্ত্রী বাদে সকলের সাথে স্বাভাবিক আচরণ করছে। মধুমিতা আর কাজে যাচ্ছে না। তার চাকরি চলে গেছে। ভয়ে সে-ও স্বামীর সাথে কথা বলছে না।

সকালবেলা। জয়দেব কাজে যাবার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। ছেলেমেয়েরা একটু আগে স্কুলে চলে গেছে। ফোন বেজে উঠলো। রূপালি ফোন করেছে। জয়দেব রিসিভার কানের কাছে নিতেই রূপালি বললো।

–কী যেন একটা খবর শুনলাম? অনেকটা ব্যাঙ্গ করে বললো রূপালি।

–হ্যাঁ আমিও শুনেছি। ম্যাডোনা আর তার স্বামীর মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। আপনি এত দেরি করে এ খবর জানলেন? থাকেন কোথায় বলুন তো ।

অনেকটা ভ্যাবাচেকা খেয়ে গেল রূপালি। প্রথমত সে বুঝতে পারেনি জয়দেব এখনো বাসায় আছে এবং দ্বিতীয়ত বুঝতে পারেনি সে এমন করে ফোনের জবাব দিবে।

–বৌদি বাসায় নেই? এবার একটু নরম সুরে বললো রূপালি।

–না, ও তো আপনাদের বাসায় গেছে। এলে কিছু বলতে হবে?

ধান্দায় পড়ে গেল রূপালি। মধুমিতা তার বাসায় যায়নি। জয়দেব এমন আগোছালো করে কখনো কথা বলেনি। তবে সে যা শুনেছে সব সত্যি?

–আমাদের বাসায় কেন? সে তো আমাদের বাসায় আসেনি।

–যদি একটু সস্তা পরামর্শ পাওয়া যায়।

আর কোনো কথা না বলে রূপালি ফোন রেখে দিলো।

রূপালি কী বলেছে সে কথা মধুমিতা শুনতে পায়নি। স্বামী কী বলেছে সেটা মধুমিতা শুনতে পেয়েছে। রূপালির উপর এখন মধুমিতাও ক্ষিপ্ত। সে এক হাজার ডলার ধার দিলে হয়তো এমন কান্ড ঘটতো না।

সন্ধ্যার পর। নির্মল বাবু কাজ থেকে এসে বিশ্রাম নিচ্ছেন। জয়দেব তার বাসায় গিয়ে উঠলো। গত কয়েকদিন তাদের মধ্যে আর যোগাযোগ হয়নি। নির্মল বাবু ইচ্ছে করেই আর জয়দেবের সাথে যোগাযোগ করেননি। ভেবেছেন কয়েকদিনে পরিস্থিতি একটু শান্ত হোক। জয়দেবকে এখন খুবই শান্ত দেখাচ্ছে।

–তারপর জয়দেবদা কাজকর্ম কেমন চলছে? প্রশ্ন করলো নির্মল বাবু।

–চলছে কোনোরকম। সবকিছু স্বাভাবিক করে নেওয়ার চেষ্টা করছি। লম্বা নিঃশ্বাস ত্যাগ করলো জয়দেব।

–জ্ঞানীর মতো কথা। সবকিছু স্বাভাবিকভাবে মেনে নেওয়াই ভালো। পুরনো কথা মনে করলেই বরং কষ্ট বাড়ে। বসুন, চুলায় চা বসিয়ে দিই। বলে নির্মল বাবু চুলায় দু'জনের পরিমান চা-এর জল বসিয়ে দিলো। বড় একটি কৌটা থেকে কিছু টোস্ট নিয়ে আবার জয়দেবের কাছে এসে বসলেন।

–ওদের জন্য টিকেট বুকিং দিয়েছি নির্মলদা। টোস্ট খেতে খেতে বললো জয়দেব।

–দেশে যাবেন? যান। দেশ থেকে ঘুরে এলে ভালো লাগবে। এমনিতেই তো কত বছর যান না। জবাব দিলেন নির্মল বাবু।

–আমি যাচ্ছি না। ওদেরকে পাঠিয়ে দিবো। শান্ত গলায় বললো জয়দেব। চমকে উঠলো নির্মল বাবু। এমন কথা যেন প্রত্যাশা করেননি।

–ওদেরকে পাঠিয়ে দিচ্ছেন মানে?

–মানে, আমি যা ছিলাম তাই থাকবো। সবাইকে দেশে পাঠিয়ে দিবো।

–আপনার মাথা ঠিক আছে তো? আপনাকে দেখে আমার মনে হয়েছিল সব বোধহয় ঠিকঠাক হয়ে গেছে।

–সব তো ঠিকঠাকই আছে। ঐ রমণীর সাথে আমি আর ঘর করবো না। ছেলেমেয়েদের এখানে রেখে ওকে একা পাঠিয়ে দিলে শাস্তিটা পরিপুর্ণ হয় না। আগে সবাই দেশে যাক, তারপর আমি গিয়ে একটা চূড়ান্ত মীমাংসা করে আসবো।

–আপনি কী বুঝতে পারছেন আপনি কী বলছেন?

–যা বলছি তা বুঝে শুনেই বলছি এবং যা করছি তা ঠান্ডা মাথা-ই করছি। আপনি তো বলবেন স্ত্রী-ছেলেমেয়েদের ছেড়ে আমি কী করে থাকবো। আমার সাধ মিটে গেছে। ঐ মহিলা আমার জীবনটাকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে। এরপর হয়তো আরো বড় ধরনের কোনো অঘটন ঘটতে পারে। তার আগেই পাঠিয়ে দিবো।

-বৌদি না হয় অপরাধ করেছে মেনে নিলাম। তিনটা সন্তানের এমন উজ্জ্বল ভবিষ্যতটা নষ্ট করবেন শুধু একজনকে শাস্তি দিতে গিয়ে? আপনি যদি আপনার ইচ্ছা পূরণ করেন তাহলে আপনার রাগটাই প্রতিষ্ঠিত হলো। ক্ষমা যে মহত্বের লক্ষণ তা প্রতিষ্ঠিত হলো না এবং একটা রাগ থেকে একটা সংসার ধ্বংস হলো। আপনার শোচনীয় পরাজয় হলো। প্রতিষ্ঠিত হলো যে এখানে হাজার হাজার বাংলাদেশি পরিবার বাস করছে শুধু আপনারা বাস করতে পারেননি। লোকে আপনাদের নিন্দা করবে।

-আপনার প্রতিটি কথা যুক্তিসঙ্গত। আপনার কথা উপেক্ষা করার সাধ্য আমার নেই। কিন্তু আমি আমার সিদ্ধান্ত থেকে নড়বো না। জীবন তো একটাই এক জীবনে কত বিরহ সহ্য করবো। মধুমিতাকে আর কন্ট্রোলে আনা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। ও বিগড়ে গেছে।

-সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি সব ঠিক করে দিবো। মাথা থেকে এসব ঝেড়ে ফেলে দিন। বসুন, চা বানিয়ে আনি।

চা বানিয়ে ফিরে এলেন নির্মল বাবু। জয়দেবকে চা দিলেন, নিজেও নিলেন। কিছুক্ষণ নিরবতা।

-বাসায় বলেছেন এসব কথা? একবার ভেবেছেন ছেলেমেয়েগুলো কী প্রচন্ড আঘাত পাবে? আপনার রাগ ওদেরকে কোথায় নিয়ে ঠেকাবে? বললেন নির্মল বাবু।

-সব চিন্তা-ভাবনা করেই এ সিদ্ধান্ত নিয়েছি। জীবনে এই প্রথম পুলিশ আমার হাতে হাতকড়া পড়ালো। চুরি-ডাকাতি খুন-খারাপি কোনোটাই নয়। স্ত্রীর গায়ে হাত তুলেছি এই অপরাধে। এই অপমান কী ভোলা যায়? বার বার ও আমাকে পুলিশের ভয় দেখিয়েছে। শেষ পর্যন্ত পুলিশ ডেকেই ছাড়লো। এ জীবন কী আর স্বাভাবিক হবে মনে করেছেন? জীবনে আর সুখের দেখা পাবো?

-আপনার অপমানটা আমি বুঝি দাদা। ঘটনা শুধু এখানে নয়। ঘটনার অন্তরালে ঘটনা আছে। এখন যেটা করতে যাচ্ছেন সেটা নিজেকে নিজে শেষ করে দেওয়া। আমার উপর যদি বিশ্বাস রাখতে পারেন তবে আমাকে দায়িত্ব দেন, আমি সব ঠিক করে দিবো। জীবনে এমন ঘটনা আর কখনো ঘটবে না। আপনি যে ক'দিন ওখানে ছিলেন বেচারি শুধু জল খেয়ে দিন কাটিয়েছে। আমি দেখেছি তার করুণ অবস্থাটা। ঐ যে আপনি কথায় কথায় বলেন হলিউডের ডাইলের পানি পেটে পড়লে আর দিক-দিশা থাকে না, তার অবস্থা সত্যি সে রকম হয়েছিল। একটি ভুল থেকে এত বড় সর্বনাশ ঘটতে দেওয়া উচিত নয়। ক্ষমা করে দিন। কেউ ২/৩ দিন জেল খাটলেই দাগী আসামি হয়ে যায় না। শেখ হাসিনার কথা ভাবুন, খালেদা জিয়ার কথা ভাবুন এত বড় সম্মানীত মানুষ হয়ে তাঁরা মিথ্যে অভিযোগে জেল খেটেছেন। দেশের মানুষ কিন্তু তাদেরকে বর্জন করেনি। তাঁদের জনপ্রিয়তা বরং বেড়েছে। তারা যে ক্ষমতার অধিকারী, তাঁরা চাইলে মিথ্যে অভিযোগকারীদের অনেক কিছু করতে পারে। অথচ দেখুন, তাঁরা সবকিছু স্বাভাবিকভাবে মেনে নিয়েছেন। রাগ শুধু ধ্বংসই ডেকে আনবে। পারলে দেশের থেকে সবাই একত্রে ঘুরে আসুন। ভালো লাগবে। না চাইলেও জীবনে অনেক অঘটন ঘটে যায়। তারপরও জীবন থেমে থাকে না। জীবনের নিয়মে জীবন চলতেই থাকে। আজ যে সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছেন, ক'দিন পরে আবার আমাকেই বলবেন-কী সর্বনাশ করলাম নির্মলদা।

-ন্যাড়া বেলতলায় একবারই যায়। একবার যদি পাঠিয়ে দিই তো আবার ফেরত আনবো ভেবেছেন? কিছু মানুষের স্বভাই আছে এরকম, যা আর কিছুতেই বদলায় না।

-কথাটা বোধহয় সত্য নয়। আসার পর বৌদিকে এরকম দেখিনি। দেশে থাকতেও কখনো তার আচরণ সম্পর্কে কোনো অভিযোগ আপনার মুখে শুনিনি। গত বছর দুয়েক সে একটু ত্যাড়া হয়ে গেছে। আপনি এর কারণ খুঁজে বের করুন। সমাধান পেয়ে যাবেন।

-কারণ আর কী খুঁজবো? কারণ তো খোঁজাই আছে। ওর বাপ-মাকে কাড়ি কাড়ি ডলার পাঠাতে পারলে সব ঠিকঠাক। আজ এ অবস্থার জন্য দায়ী কে? আমাকে পুলিশ ধরেছে তারা শুনলে ভীষণ আনন্দ পাবে।

–আপনি যখন সমস্যার কথা জানেন তাহলে সমাধানের পথও আপনাকেই বের করতে হবে। আমি বলবো রাগের মাথায় এমন কোনো সিদ্ধান্ত নিবেন না যাতে সারা জীবন অনুতাপের আগুনে পুড়ে মরতে হয়।
–আপনার প্রত্যেকটি কথা খুবই মুল্যবান নির্মলদা কিন্তু আমি এমন আঘাত খেয়েছি যে ওকে এখন সহ্য করা আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। কাজেই ওকে আর এখানে রাখবো না।

–আমি শুধু একটা কথাই বলবো যা-ই করেন ভেবে চিন্তে করবেন। বৌদি একটা ভুল করে বড় ধরনের বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে, আপনি যা করতে যাচ্ছেন সেটা আরো বড় ধরনের বিপর্যয়। ছেলেমেয়েগুলো দেশে গেলে বিগড়ে যাবে, বৌদি যদি আরো বিগড়ে যায় আপনি কিছু করতে পারবেন? ক্ষতি যা হওয়ার আপনারই হবে। অন্যরা আহা-উহু করে সান্ত্বনা দিবে যা আপনার কোন কাজেই লাগবে না ।
–আমি তাহলে উঠি নির্মলদা। আপনার মুল্যবান সময় নষ্ট করলাম।
–কী যে বলেন না। আমি এখন এমন কি-ই বা করতাম? বড় জোর একটু টিভি দেখতাম।

নির্মল বাবু জয়দেবকে গেটের বাইরে পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন। বাসায় আসার পথে নির্মল বাবুর কথাগুলো জয়দেবের বারবার মনে পড়ছে। সে জানে সবাইকে দেশে পাঠিয়ে দিলে তার জীবনটা কত দুর্বিষহ হয়ে উঠবে কিন্তু মধুমিতার ব্যবহারে সে এতটাই মর্মাহত যে এ ধরনের একটি সিদ্ধান্ত সে না নিয়ে পারেনি। ক্ষমা করে দেওয়া যায়। সেটা জয়দেবের জন্য কোনো ব্যাপার নয়। জয়দেবের বদ্ধমুল ধারণা মধুমিতা ক্ষমার অর্থ বুঝতে পারবে না। সেটা জয়দেবের দুর্বলতা বলে ধরে নিবে। তাই সে ক্ষমা করতে সাহস পাচ্ছে না।

বাসায় চলে এলো জয়দেব। ছেলেমেয়েরা পড়ালেখা করছে। মধুমিতা আপন মনে রান্নাবান্না করছে। জয়দেব ঘুরেফিরে ছেলেমেয়েদের মুখের দিকে তাকাচ্ছে। এমন একটি নিষ্ঠুর কথা ওদেরকে বলতেই হবে। কথাটা শোনার পর কী রূপ ধারণ করবে এই কচিমুখগুলো। শূন্যতায় ভরে যাবে এই ঘরটি আবার। কল্পনায় সন্তানদের মুখ কল্পনা করবে সে।

সারা ঘর পায়চারি করছে জয়দেব।
–তোমার কিছু হয়েছে বাবা? মেয়ের কথায় সম্বিত ফিরে পায় জয়দেব।
–না তো। তোমাদেরকে একটা কথা বলবো। তাই ভাবছি কীভাবে কথাটা বলা যায়। করুণ দৃষ্টিতে জয়দেব মেয়ের মুখের দিকে তাকালো।
–সবাই মনোযোগ দিয়ে আমার কথা শোনো–আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি তোমাদের সবাইকে দেশে পাঠিয়ে দিবো। আজ টিকেট বুকিং দিয়ে এসেছি। সামনের ১৭ তারিখে তোমাদের ফ্লাইট। এরমধ্যে তোমরা গোছগাছ করে নিতে পারো।
মুহূর্তে ঘরময় যেন শ্মশানের নীরবতা নেমে এলো। করুণ দৃষ্টিতে প্রিয়ন্তি, জয়ন্তও পড়ন্ত বাবার মুখের দিকে তাকালো। রান্নাঘর থেকে মধুমিতা স্বামীর সব কথা শুনেছে।
–আমরা কী দোষ করেছি বাবা? পাঠাতে হলে মাকে পাঠাও। মার জন্য আমরা যাবো কেন? প্রিয়ন্তি বললো।
–আমি এই স্কুল ছেড়ে চলে যাব বাবা? দেশে এমন স্কুল আছে? জয়ন্ত বললো।
–আমি যাব না। কিছুতেই যাব না। পড়ন্ত বায়না ধরলো।
–সবাইকে যেতে হবে। আমি এখানে আর কাউকে রাখবো না। তোমরা আমার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে আমার জীবনটাকে অতিষ্ঠ করে তুলেছো। এখানে আর কাউকে আমি রাখবো না।
ছেলেমেয়েরা এসে জয়দেবকে ঘিরে ধরলো।
–তোর বাবাকে বল প্রিয়ন্তি, অপরাধ যখন আমি করেছি আমি যাই। তোরা থাক। আমার জন্য তোদের জীবনটা নষ্ট করবি কেন? রান্নাঘর থেকে জয়দেবকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললো মধুমিতা।

–বলে দাও যে এখানে আর কারো থাকা হবে না। কথা যখন কানে যায়নি এবার বোঝো আমি ক্ষেপে গেলে কেমন হই? জয়দেব বললো মেয়েকে।
–আমরা থাকি বাবা। আমি তো জয়ন্ত পড়ন্তকে টেককেয়ার করতে পারি। মা কাজে গেলে আমরা একা থাকিনি? বাবার গলা জড়িয়ে ধরে বললো প্রিয়ন্তি।
–বললাম তো এখানে কারো থাকা হবে না। আমি কাউকে এখানে রাখবো না। তোমাদেরকে এখানে এনে আমি ভুল করেছি। পাঠিয়ে দিয়ে আবার সে ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করবো।
প্রিয়ন্তি বাবার গলা ছেড়ে বেডরুমে গিয়ে অঝোরে কাঁদতে লাগলো। ছোট দু'ভাইও সাথে সাথে কাঁদতে লাগলো।
সোফায় নিশ্চুপ বসে আছে জয়দেব। ছেলেমেয়েদের কান্না সে শুনতে পাচ্ছে। মধুমিতা মূর্তির মতো রান্নাঘরে কাজ করে যাচ্ছে। এমন একটি কথা জয়দেব বলবে সে যেন কল্পনাও করতে পারছে না। গত কয়েক দিন স্বামীকে সে স্বাভাবিক আচরণ করতে দেখেছে। সে ধরে নিয়েছিলো জয়দেব স্বাভাবিক হয়ে আসছে। আর একটু স্বাভাবিক হলেই স্বামীর পা ধরে ক্ষমা চেয়ে নিবে। এরি মধ্যে এমন কঠিন সিদ্ধান্ত। সে যখন তার সিদ্ধান্ত থেকে একচুলও নড়বে না তাহলে আর ক্ষমা চেয়ে লাভ কী? মধুমিতা মনে মনে সিদ্ধান্ত নেয় সকালে নির্মল বাবুকে ফোন করবে। একমাত্র নির্মল বাবুই এর সমাধান করতে পারেন।

সকালবেলা জয়দেব কাজে বের হবার আগে প্রিয়ন্তি এসে বাবার সামনে দাঁড়ালো।
–আমরা কী আর স্কুলে যাব না বাবা? প্রিয়ন্তির মুখ ভার।
–আর গিয়ে কী লাভ হবে? বলেই জয়দেব বের হয়ে যায়।
মধুমিতা নির্মল বাবুকে ফোন করে। নির্মল বাবু বাসায়ই ছিল। মধুমিতা ফোনে যেন কথা বলতে পারছে না। তার কণ্ঠ জড়িয়ে আসছে। গলা শুকিয়ে গেছে। একটি ভুল, একটি রাগ থেকে এমন সর্বনাশ নেমে আসবে সে কল্পনাও করতে পারছে না।
নির্মল বাবু ফোন রিসিভ করেই মধুমিতাকে সান্ত্বনা দেন। জানে, মধুমিতা কী বলবে। কারণ গতরাতেই জয়দেব তার সিদ্ধান্তের কথা নির্মল বাবুকে জানিয়েছে।
–আপনি কিছু চিন্তা করবেন না বৌদি, আমি বিকালে আপনাদের বাসায় আসবো । দাদা যা বলে কোনো কথার জবাব দিবেন না। দেখি আমি কী করতে পারি।
–আমি তো আমার নিজের জন্য কিছু ভাবছি না দাদা, ভাবছি ছেলেমেয়েগুলোর জন্য। আজ ওদেরকে স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। আমাদের সবাইকে দেশে পাঠিয়ে দিবে। একটা ভুলের জন্য এত বড় সর্বনাশ হবে? আমার কী কোনো ক্ষমা নেই? যে মা-বাবাকে খুশি রাখতে গিয়ে আজ আমার নিজের কপাল পুড়েছে সে মা-বাবার সাথে আমি সব সম্পর্ক ছিন্ন করে দিয়েছি। এখন আমার স্বামী, সন্তান ছাড়া আর কোনো ভাবনা নেই। জোরে জোরে কেঁদে দিলো মধুমিতা।

–শান্ত হোন বৌদি, শান্ত হোন। আমার ওপর ভরসা রাখুন। আমি একটা ব্যবস্থা করবো।
–প্রিয়ন্তির বাবার মোবাইলে ফোন করে যদি ওদের স্কুলের যাবার পারমিশনটা নিয়ে দিতে পারেন। কান্না জড়িত কণ্ঠেই বললো মধুমিতা।
–তাহলে তো আরো ক্ষেপে যাবে। আমাকে যদি প্রশ্ন করে ওদের স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে তা আমি কী করে জানি? তাহলে তো আপনার নাম এসে যাবে। একদিন স্কুলে না গেলে তেমন ক্ষতি হবে না। আপনার সাথে যে আমার কথা হয়েছে এটা দাদাকে বুঝতে দিবেন না। আমি কাজ থেকে এসে এমনিতেই চলে আসবো। একটা রেজাল্ট বের করবো। আপনি এত ভেঙে পড়বেন না।
–সামনে ওদের পরীক্ষা। সব স্বপ্নগুলো ধুলায় মিশে গেল দাদা। বলেই জোরে জোরে কেঁদে দিলো মধুমিতা। ছেলেমেয়েরা এসে মায়ের পাশে জড়ো হলো। সবাই বাকরুদ্ধ। বাবা সকাল বেলা এমন একটি নিষেধাজ্ঞা জারি করবে তা যেন তারা ভাবতেই পারছে না।

ফোন রেখে দিলো মধুমিতা। কপাল চাপড়াতে লাগলো সে।

–তোরা মার আমাকে, আমাকে মার। আমার ভুলের জন্য তোদের কপাল পুড়লো। মার আমাকে। ছেলেমেয়েরা মাকে জড়িয়ে ধরলো।
–আমার মন বলছে বাবা শেষ পর্যন্ত সব ভুলে যাবে মা। কাঁদতে কাঁদতে বললো প্রিয়ন্তি।
–তাই যেন হয়। ঠাকুরকে বল তোর বাবা যেন সব ভুলে যায়, আর ঠাকুরকে বল আমাকে যেন নিয়ে নেয়। মা হয়ে আমি তোদের কপাল খেলাম।

সন্ধ্যার পর। ঘরে পাঁচজন মানুষ আছে। মনে হয় এরা যেন জীবিত নেই। নড়েচড়ে, শব্দ নেই, মুখ নড়ে কথা নেই। নীরবতা ভঙ্গ হয় দরজায় টোকা শুনে। নির্মল বাবু এসেছেন। জয়দেব উঠে দরজা খুলে দেয়। নির্মল বাবুকে দেখে জয়দেব বাদে চারজনের দেহে যেন প্রাণ ফিরে আসে।
–ফোন না করেই চলে এলাম। বলে নির্মল বাবু।
–আপনার আসতে ফোন করতে হবে কেন? জবাব দেয় জয়দেব।
প্রিয়ন্তি, জয়ন্ত, পড়ন্ত নির্মল বাবুর আশপাশে ঘুরঘুর করছে। তারা চায় নির্মল বাবু তাদেরকে কিছু জিজ্ঞাসা করুক।
–পড়ালেখা কেমন চলছে প্রিয়ন্তি? প্রশ্ন করে নির্মল বাবু।
–বাবা স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে, বলেই কেঁদে দিলো প্রিয়ন্তি। প্রিয়ন্তি বেডরুমে চলে গেল। সাথে কাঁদতে কাঁদতে দু'ভাইও চলে গেল।
–এসব আপনি কী শুরু করলেন দাদা? একটা সংসার এভাবে ধ্বংস করে দিবেন? জয়দেবের দিকে তাকিয়ে বললেন নির্মল বাবু।
–সর্বনাশ চাইলে সর্বনাশ হবে। আমার কোনো কথার গুরুত্ব দিয়েছে? এই আমেরিকার মাটিতে পা রাখা পর্যন্ত এই লোকটা যে অমানুষিক পরিশ্রম করেছে তা আপনার চেয়ে ভালো কে জানে? এই সর্বনাশের জন্য এত ত্যাগ স্বীকার? যাদের খুশি রাখতে এই সর্বনাশের খেলা, দেশে গিয়ে তাদের সেবা যত্ন করুক। যাদের মাল তাদের ফিরিয়ে দিলাম। মাঝের থেকে তিনদিন হাজতবাস।

–ভুলে যান তো ঐসব। জীবনে এমন ঘটনা কত ঘটে। নির্মল বাবু বললেন।
মধুমিতা রান্না ঘর থেকে একটু সামনে এলো–দাদা, বলুন যে আমি তাদের সাথে সকল প্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করেছি। আমি আমার কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত। আমি ক্ষমা চাই । আমাকে পাঠিয়ে দিলে আমার কোনো আপত্তি নেই। জীবনের আর আছেই বা ক'দিন। ওরা থাক। ওদের জীবনটা যেন ধ্বংস না হয়। আমি লোক ভালো না ঠিক আছে। কিন্তু আমি তো ওদের মা। আমার তো সাধ্য নেই ওদেরকে এখানে রাখি। কেঁদে দিলো মধুমিতা।
–শুনলেন তো। শুনলেন তো নিজের কানে? সব ভুলে যান। স্বাভাবিক হন। সব ঠিক হয়ে যাবে। কারো কারো জীবনে এরচেয়ে বড় বড় ঘটনাও ঘটে। ওদেরকে আগামীদিন থেকে স্কুলে যেতে দিন। নির্মল বাবু জয়দেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললো। মধুমিতা রান্না ঘরে চলে গেছে।

–স্কুলে যেতে চাইলে যাবে। মাঝে আছে আর কয়েকদিন। এই কয়েকদিন স্কুলে গিয়ে যদি শান্তি পায় তবে যাক। আমি আমার সিদ্ধান্ত থেকে একচুলও নড়বো না।
–বৌদি যে ক্ষমা চাইলো। তার কোনো মূল্য নেই? নির্মল বাবু বললো।
–শয়তানকে ক্ষমা? এটা আবার নতুন কোনো চাল হতে পারে। ওকে আমার বিশ্বাস নেই। দু'দিন পরে আবার দেখবেন নতুন রূপ ধরেছে।
–সে দায়িত্ব আমার উপর ছেড়ে দিন। এরপর কোনো অঘটন ঘটলে সব দায় আমার। একটা শেষ সুযোগ দিন। দেখেন না কী করে। বললো নির্মল বাবু।
–আমি রান্না বসিয়েছি নির্মলদা, খেয়ে যাবেন। রান্নাঘর থেকে বললো মধুমিতা।
–না, না আমার জন্য রান্না করবেন না। সমস্যার কোনো সমাধান করতে পারছি না, কিসের খাওয়া? জবাব দিলো নির্মল বাবু।
–যা করেছেন তা কম কীসে? আপনি এভাবে না করলে আমাদের অবস্থা কোথায় গিয়ে দাঁড়াত? উত্তর দিলো জয়দেব।

–আমার উপর যদি এতই আস্থা তবে আমার শেষ অনুরোধটা রাখেন। সব ভুলে যান। টিকেট ক্যান্সেল করেন। আগামী দিন থেকে সব স্বাভাবিক হয়ে যাক। জয়দেবের দিকে তাকিয়ে বললো নির্মল বাবু।

–সবই স্বাভাবিকভাবে চলবে। আমরা যখন এই লস এঞ্জেলেসে ছিলাম না তখনো সব ছিল, আমরা আছি, সব আছে, আমরা থাকবো না সব থাকবে। যাকে যেখানে মানায় তাকে সেখানেই থাকা উচিত। জয়দেব বললো।

–আপনি কিন্তু আপনার কথাই বলছেন জয়দেবদা। আমার কথা মানছেন না। নির্মল বাবু বললো।

–একজন মানুষ যদি একটা ভুল করে সে মানুষটা কী আর দু'টো শুদ্ধ কাজ করতে পারে না? এ ক'দিনে মধুমিতা বদলে গেছে। সেটা এখন কী করে প্রমাণ করি? আপনার অনুরোধ করার দরকার নেই নির্মলদা, আমরা চলে যাবো। আমি তো একটা ক্ষেত। ক্ষেতের মানুষ ক্ষেতেই চলে যাবো। বাংলাদেশে ষোল কোটি লোক থাকে না? আমরাও থাকতে পারবো। ক্ষমা চেয়ে যদি ক্ষমা পাওয়া না যায় তবে আর কী করা? ধরে নিলাম পৃথিবীতে আমেরিকা বলতে কোনো দেশ নেই। অভিমানের সুরে বললো মধুমিতা।

খানিকক্ষণ নীরবতা। কেউ কোনো কথা বলছে না। মধুমিতা আপন মনে রান্না করছে। নির্মল বাবু খাবে বলে মধুমিতা আজও শুঁকটি মাছ রান্না করছে । নির্মল বাবু যে শুঁটকি মাছ খুব পছন্দ করে সেটা মধুমিতা প্রথমদিনই তাকে খাওয়াতে গিয়ে বুঝেছিল।

–আমি উঠি জয়দেবদা। আরেক দিন খাবো। নির্মল বাবু উঠে দাঁড়ালো।

–বসুন তো। আপনার জন্য শুঁটকি মাছ রান্না করছে, আপনি না খেয়ে চলে যাবেন, আমরা সেটা কী করে খাবো? বলেছিলাম ন্যাড়া বেলতলায় একবারই যায় কিন্তু যখন গাছে বেল না থাকে তখন তো ন্যাড়ার বেলতলায় যেতে ভয় নেই।

–ঠিক বুঝলাম না। নির্মল বাবু সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে জয়দেবের দিকে তাকালো।

–সিদ্ধান্ত যখন নিয়েছি, পাঠিয়ে দিবো। কিছুকাল দেখবো যদি কোনো উন্নতি হয়েছে বুঝতে পারি তাহলে বেলতলায় আবার যেতেও পারি। ব্যাঙ্গাত্মক করে বললো জয়দেব।

–নির্মলদা, আপনার বন্ধুকে বলে দিন যদি চলে যাই তাহলে আর কোনোদিন ফিরে আসবো না। ছেলেমেয়ে নিয়ে দেশে কোনো না কোনোভাবে চলে যেতে পারবো। ধরে নিবো আমি...। কথা শেষ করে না মধুমিতা।

ছেলেমেয়েসহ সবাইকে একসাথে খেতে দিলো মধুমিতা।

–আপনাকে আর একটু শুঁটকি দিবো নির্মলদা? মধুমিতা বললো। করুণ দৃষ্টিতে নির্মল বাবু মাথা তুলে মধুমিতার দিকে তাকালেন। হ্যাঁ বা না কিছুই বললো না।

–আর তো মাত্র কয়েকদিন, তারপর তো সবই ইতিহাস। মধুমিতা বললো।

–এরপর কী খাওয়া গলার নিচে নামে? আমি আপনাদের আপন কেউ নই। এখানে আসার পরই পরিচয়। আমার মনে হয় আমারই বুঝি একটা সর্বনাশ হতে চলেছে। আমার কথা রাখলে মনে হয় আপনাদের খারাপ হতো না। নির্মল বাবু বললেন।

–আপনি খান তো দাদা। আমাদের জন্য আপনি মন খারাপ করবেন কেন? সব গল্পই এক সময় না এক সময় শেষ হয়। মনে করুন, আমরা গল্পের শেষ প্রান্তে চলে এসেছি। তিন বছর আমেরিকা থেকেছি, ডাইলের পানি খেয়েছি, এটাই বা কম কী? আমার আটাশ পুরুষের মধ্যে তো কেউ আমেরিকা দেখেনি।

নির্মল বাবু চলে যাবার পর জয়দেব ফ্লোরে বিছানা করে শুয়ে পড়লো। জেল থেকে আসার পর সে আর মধুমিতার সাথে এক বিছানায় ঘুমায়নি। জয়দেব নিজে বিছানা করে, মধুমিতা কম্বল-বালিশ এগিয়ে দেয়। কেউ কারো সাথে কথা বলে না। এভাবেই কেটেছে গত কয়েকদিন।

একটু পরেই জয়দেব আস্তে করে নাক ডাকতে থাকে। মধুমিতা ধরে নিয়েছে সে ঘুমিয়ে গিয়েছে। আসলে সে ঘুমায়নি। ঘুম আসছে মাত্র। এতক্ষণ সে ভাবছিল আসলেই কী মধুমিতা বদলে গেছে? সে তার ভুল বুঝতে পেরেছে? তাকে কী ক্ষমা করে দেওয়া যায়? সবকিছু কী ভুলে যাওয়া যায়, যেন কিছুই

ঘটেনি? অনেকটা কম্পিউটারের হার্ডডিস্ক থেকে কোনো প্রোগ্রাম ডিলিট করে দেওয়ার মতো। মধুমিতার শেষ কথাগুলো ভাবিয়ে তোলে জয়দেবকে। এ ক'দিন মধুমিতাকে খুবই বিমর্ষ দেখাচ্ছে।

বিছানা থেকে আস্তে করে নামে মধুমিতা। রান্নাঘর থেকে সরিষার তেলের বোতল নেয়। ডানহাতের তালুতে কিছুটা তেল নেয়। সাথে সামান্য ঠান্ডা জল। স্বামীর মাথায় তেল-জল মালিশ করে মধুমিতা। এরপর একটা বিছানা নিয়ে জয়দেবের বিছানার পাশে, অনেকটা জয়দেবের বুকের থেকে নিচের দিকে কুন্ডলি করে শুয়ে থাকে মধুমিতা।

মধুমিতা ও জয়দেবের মাঝে কোনো প্রাচীর নেই। কিন্তু মধুমিতার কাছে মনে হয় দু'জনের মাঝে বিশাল এক প্রাচীর যা দু'জনকে আলাদা করে রেখেছে। সে অবাক হয় এই ভেবে যে কত সামান্য কারণেও মানুষের মন কত শক্ত হয়ে যেতে পারে। কী বিচিত্র মানুষের মন। যা নির্ণয় করা একেবারেই অসম্ভব। রাগ না করার যদি কোনো টিকা আবিষ্কৃত হতো তাহলে কত ভালো যে হতো। কত কষ্ট এড়ানো যেত একটি অগ্রিম টিকা দিতে পারলে, ভাবে মধুমিতা।

১৭ তারিখ ক্রমেই কাছিয়ে আসছে। জয়দেব তার সিদ্ধান্তে অটল। নির্মল বাবু এর মাঝে তাকে আরো কয়েকবার বুঝিয়েছে কিন্তু কোনো কাজ হয়নি। ছেলেমেয়েরা বারবার বাবার কাছে আবদার করে উপেক্ষিত হয়ে চলে যাওয়াটাই শ্রেয় মনে করছে। ১৭ তারিখ এখন আরো এগিয়ে এলেই যেন তাদের ভালো। চলে যখন যেতে হবে তাহলে দেরি কেন। ছেয়েমেয়েরা বাবার সাথে কথা বলা অনেকটা বন্ধ করে দিয়েছে।

সন্ধ্যার পর অলস বসে আছে জয়দেব। ছেলেমেয়েরা এখন আর পড়াশুনা করছে না। গতকাল থেকে স্কুলে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছে।

ফোন বেজে উঠলো। জয়দেব এগিয়ে গিয়ে কানের কাছে রিসিভার নিলো। হ্যালো বলতে মুনমুনের মার গলা শোনা গেল। শুদ্ধ করে বাংলা বলে মুনমুনের মা। নদীয়া-শান্তিপুরের বাঙালিদের মতো।

-হ্যাঁলো দাদা কেমন আছেন? শুনলাম বৌদি ছেলেমেয়েসহ নাকি দেশে চলে যাবেন?

রাগ হয় জয়দেবের। এসব কথা তার কানে গেল কী করে। পরক্ষণেই সে আবার নিজেকে সামলে নেয়। এখানে কথা বাতাসে ভেসে বেড়ায় সে কথা সে ভুলেই গিয়েছিলো। আরো ভুলে গিয়েছিলো ঢেঁকি স্বর্গে গিয়ে ধান ভানার কথা।

-আপনি জানলেন কী করে? প্রশ্ন করে জয়দেব।

-কেন, সবাই জানে আমি জানলে দোষ আছে? এখন এখানে যে খরচ, ফ্যামিলি নিয়ে থাকা খুব কষ্টকর। তার চেয়ে দেশে অনেক ভালো।

-হ্যাঁ, ওরা চলে গেলে আপনাদের খরচ অনেক কমে যাবে।

-কেন, আপনি এমন করে কথা বলছেন কেন?

-আপনাদের সাধ কী মেটেনি? আপনার জ্ঞান দেওয়া শেষ হয়েছে? নিজেকে সামলে রাখতে পারছে না জয়দেব। কাটা ঘায়ে লবণের ছিটা খুব লাগে।

মুনমুনের মা ফোন রেখে দিল। দু'তিনবার হ্যালো হ্যালো বলে জয়দেব রিসিভার রেখে দেয়। স্ত্রীর দিকে কড়া নজরে তাকায় সে। মধুমিতা নির্লিপ্ত। এক জীবনে এরচেয়ে বড় ক্ষতি আর কী হতে পারে। আর ক'দিনের জন্য ভয় পেয়ে কী হবে। নীরব ভাষায় সে যেন বলছে, বলেছি তো কী হয়েছে? আমাকে পারলে কিছু করো।

জয়দেব নিজেকে সামলে নেয়। কাজটা মধুমিতারই হতে পারে বলে সে অনুমান করে। কী হবে আর রাগ করে? আর তো মাত্র ক'টা দিন। চলে গেলে সবাই জানবে। শেষ পর্যন্ত নির্মল বাবুর কথাই সত্য হবে ; এতো বাঙালি এখানে থাকে অথচ তারাই ছিল এখানে বেমানান। দেশের লোকও একই কথা বলবে। কত জটিল জীবনের ধাপগুলো। কী যেন একটা তাড়া করে জয়দেবকে। ধরতে পারে না। তাড়াতে পারে না অথচ জীবনটাকে এলোমেলা করে দেয়। সব হিসাব-নিকাশ তালগোল পাকিয়ে দেয়। কী করা সত্যিকারের উচিত বুঝতে পারে না জয়দেব।

১৭ তারিখ সকালবেলা। আজও লস এঞ্জেলেসের আকাশে সুর্যোদয় হয়েছে তার দশদিনের মতো। জয়দেব বাদে সবাই যাত্রার জন্য প্রস্তুত। যেতে নাহি দিবো, তবু যেতে হয়, তবু চলে যায় কবিতার

চরণগুলো এ ঘরে কেন যেন অচল। উল্টে গিয়ে এ ঘরে কবিতার চরণগুলো যেন এরকম–চলেই যখন যাব, তবে আর দেরি কেন, কেন মিছে অভিমান।

বাইরে থেকে দেখে কারো বোঝার উপায় নেই যে আর একটু পরেই একটি পরিবার ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে। একটি ভুল অথবা একটি খামখেয়ালিপনা থেকে জন্ম নেওয়া একটি রাগ থেকে কীভাবে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। অতি শোকে সবাই যেন পাথর হয়ে গেছে। শেষ ক'টা দিন ছিল সবচেয়ে নিশ্চুপ। আমেরিকা থেকে চারজন মানুষ দেশে ফিরে যাবে অথচ তাদের সামান্য কোনো বায়না পর্যন্ত নেই। যেন চলে যাবার জন্যই আসা। প্রত্যাশিত যাত্রা।

–আমরা রেডি বাবা। কখন বের হবো আমরা? প্রিয়ন্তি বললো।

জয়দেব কোনো জবাব দিলো না। গত তিনদিনের মধ্যে প্রিয়ন্তি এই প্রথম বাবার সাথে কথা বললো। জয়ন্ত ও পড়ন্ত বাবাকে দেখলেই দূরে সরে যায়, কথা বলা তো দূরের কথা।

–তোমাদের কারো কিছু লাগবে? জয়দেব প্রশ্ন করলো। চারজনের একজনও কোনো জবাব দেয় না। কেউ তাকায় না জয়দেবের দিকে। ভ্রুক্ষেপ করে না তার কথাকে।

–বললাম না কারো কিছু লাগবে কিনা? আবার প্রশ্ন করে জয়দেব।

–তোমার কিছু দিয়ে আমরা কী করবো? আমরা যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। কখন বের হবো আমরা? প্রিয়ন্তি ঝাঁঝালো গলায় বলে।

ভেতরটা ধুমড়ে-মুচড়ে উঠে জয়দেবের । যেন তিন/চারদিনের বাসি ডালের শুকনো চচ্চড়ির মতো। বিনা প্রতিবাদে চলে যাওয়া যে কত বড় প্রতিবাদ মর্মে মর্মে অনুভব করে জয়দেব। পনেরো বছরের মেয়ে, তেরো ও এগারো বছরের ছেলে গত তিনদিন তার সাথে কোনো কথা বলেনি। কোনো কিছুর আবদার করেনি, কোথাও যেতে চায়নি। নিজেদের সামান্য ব্যবহারিক জিনিসপত্র গুছিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত। অথচ এরা এই অবস্থায় আইনের আশ্রয় নিতে পারে। একবারও সে কথা ভাবেনি। মনে মনে ভেঙে পড়ে জয়দেব। জীবনটাকে খুব জটিল মনে হয় তার কাছে ।

দরজায় টোকা পড়ে। নির্মল বাবু এসেছে। গতকালই জয়দেব নির্মলবাবুকে বলে রেখেছে এ সময় আসতে। নির্মল বাবুর গাড়িতে মধুমিতাকে এবং জয়দেবের গাড়িতে ছেলেমেয়েদের পৌঁছে দিবে। কাস্টমস, ইমিগ্রেশনের কাজ শেষে তারা ভিতরে চলে গেলে জয়দেব ও নির্মল বাবু ফিরে আসবে।

–দরজা খোলা আছে দাদা, আসুন। বললো জয়দেব।

ভেতরে প্রবেশ করলেন নির্মল বাবু। অবাক নন তিনি, যা হচ্ছে সবই তো তার জানা। আজ এদেরকে এভাবে দেখতে পাবেন সেটা তো গত কয়েকদিন আগে থেকেই জানেন। নিবৃত্ত করতে পারেনি জয়দেবকে।

মধুমিতা সামনে এসে নির্মল বাবুকে প্রণাম করতে চেষ্টা করে। নির্মল বাবু প্রণামের সুযোগ না দিয়ে সরে যান। ছেয়েমেয়েরা নির্মল বাবু ও তার বাবাকে প্রণাম করে। মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকে জয়দেব।

–ভুল-ত্রুটি কিছু করে থাকলে ক্ষমা করে দিবেন নির্মলদা। হাত জোড় করে মধুমিতা নির্মল বাবুকে বলে। যে শাড়িটা পরে সে আমেরিকা এসেছিল, আজও সে শাড়িটা পরেছে মধুমিতা। মাঝে তিন বছর আর সেটা পরা হয়নি।

–এসব বলে আমাকে অপরাধী করবেন না। আমাদেরই দুর্ভাগ্য আমরা আপনাদের রাখতে পারলাম না। জবাব দেয় নির্মল বাবু।

–যাবার বেলা কী তাকে একটা প্রণাম করে যেতে পারি? নির্মল বাবুর দিকে তাকিয়ে স্বামীর উদ্দেশ্যে বলে মধুমিতা।

–তার আর দরকার হবে না। নির্মল বাবুর দিকে তাকিয়ে জবাব দিলো জয়দেব।

–চলেন দাদা, সময় নষ্ট করে আর লাভ কী? মধুমিতা বললো।

যার যার লাগেজ নিয়ে সবাই গাড়ির কাছে চলে গেল। পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী জয়দেবের গাড়িতে ছেলেমেয়েরা এবং নির্মল বাবুর গাড়িতে মধুমিতা।

দ্রুত গতিতে গাড়ি চলছে। আর সে সাথে স্মৃতিগুলো সব পেছনে চলে যাচ্ছে। আর মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে তারা চারজন এই শহর ছেড়ে চলে যাবে।

–আমাদেরকে কী আবার ফিরিয়ে আনবে বাবা? প্রিয়ন্তি বললো। জয়ন্ত ও পড়ন্ত কোনো কথা বলছে না। তারা বাইরের দিকে তাকিয়ে এটা–সেটা দেখছে। ক্রমে শহরটা তাদের কাছে ঝাপসা হয়ে আসছে। চেনা জিনিস অচেনা হতে কতক্ষণ?

একটা ভারি নিঃশ্বাস ত্যাগ করলো জয়দেব–দেখি কী করা যায়। আমি আসছি দেশে। তখন চিন্তা ভাবনা করবো কী করা যায়। অমনোযোগী হয়ে গাড়ি চালাচ্ছে সে।

–মা বলেছে আর আসবে না। আমাদেরকেও আর আসতে দিবে না। মা গার্মেন্টসে কাজ নিবে। প্রিয়ন্তি বললো বাবাকে।

ভেতরটা কেমন যেন চিন চিন করে উঠলো জয়দেবের। মধুমিতা দেশে গিয়ে যদি এমনই করে তাহলে জয়দেবের কী করার থাকবে। যদি জয়দেবের পাঠানো টাকা মধুমিতা আর স্পর্শ না করে তাহলেই বা কী করবে সে? ভবিষ্যতটা কেমন যেন অন্ধকার দেখতে পায় জয়দেব।

অর্ধেক পথ অতিক্রম করেছে তারা। কখনো জয়দেবের এবং নির্মল বাবুর গাড়ি কাছাকাছি আবার কখনো একটু দুরে এভাবে তারা এয়ারপোর্টের দিকে যাচ্ছে।

–জানি না কেন যে আমার মন বলছে জয়দেবদা হেরে যাবে। মধুমিতাকে বললেন নির্মল বাবু।

–সে হারার লোক নয়। সে বিজয়ী হোক, আমরা হারি। জবাব দিলো মধুমিতা।

–বাসায় তাকে খুবই বিমর্ষ দেখেছি। গাড়িও চালাচ্ছে এলোমেলো। মানসিকভাবে সে মনে হয় খুবই ভেঙে পড়েছে। নির্মল বাবু বললেন মধুমিতাকে।

–এলোমেলো গাড়ি চালাচ্ছে বুঝলেন কী করে? ওরা যে রয়েছে গাড়িতে। আতংকিত হলো মধুমিতা।

–না, ভয় পাবার কিছু নেই। সে পেশাদার চালক। অন্য সময়ও তো তার গাড়ি চালনা দেখেছি, পাশাপাশি গাড়ি চালিয়েছি। এমন করে সে গাড়ি চালায় না। বোঝেন না, মন খারাপ হলে সবই গোলমেলে হয়ে যায়। নির্মল বাবু বললেন। গাড়ি চলছে।

লস এঞ্জেলেস ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট। সবাই এসে একসাথে জড়ো হলো। তাদের তেমন কোনো লাগেজপত্র নেই বিধায় কাউন্টারে তেমন একটা সময় লাগেনি। কাস্টমসের কাজ শেষ হবার পর মধুমিতা, প্রিয়ন্তি, জয়ন্ত ও পড়ন্ত ইমিগ্রেশন চেক ইন–এর জন্য লাইন দিয়েছে। তাদের সামনে আরো কয়েকজন লোক আছে। জয়দেব সবার কাগজপত্র হাতে হাতে দিয়েছে। সামনের থেকে একজন দু'জন করে যাত্রী ইমিগ্রেশন চেক ইন করে ওয়েটিং রুমের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

মধুমিতা বার বার স্বামীর চোখের দিকে তাকাচ্ছে। যদি তার মতিগতির পরিবর্তন হয়। সবাই জানে যে আর মাত্র কিছুক্ষণের মধ্যে তারা ইমিগ্রেশন পার হয়ে ওয়েটিং রুমে চলে যাবে। তখন আর জয়দেব বা নির্মল বাবু ওদের সাথে যোগাযোগ করতে পারবে না। মধুমিতা মাথায় ঘোমটা দিয়েছে।

জয়দেবকে খুবই বিমর্ষ লাগছে। বিমর্ষ লাগছে মধুমিতাকেও। নির্মল বাবু জয়দেবকে ছায়ার মতো অনুসরণ করছে। যদি তার মত পরিবর্তন হয়। এখনো তাদেরকে ফেরানো যায়। আর কয়েক মিনিট পর হয়তো সেটা পারা যাবে না।

একজন একজন করে চারজনের ইমিগ্রেশন কাজ শেষ হবার পর তারা ধীরে ধীরে ওয়েটিং রুমের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। মধুমিতা একবার মাত্র পিছন ফিরে স্বামীর দিকে তাকিয়েছে। ছেলেমেয়েরা একবারও পিছন ফিরে তাকায়নি।

জয়দেবের মনে হলো চারটি মৃতদেহ সে সমাধিতে নামিয়ে দিয়েছে। এটাই বুঝি ওদের সাথে চিরদিনের জন্য শেষ দেখা। জয়দেবের মাথায় চক্কর দিলো। সে ঢলে নির্মল বাবুর গায়ের উপর পড়ে যাচ্ছিল। তার শরীরের তাপমাত্রা কমে এসেছে ।

নির্মল বাবু জয়দেবকে ঝাপটা মেরে ধরে তার পড়ে যাওয়া ঠেকালেন– কী হলো দাদা? নির্মল বাবু প্রশ্ন করলেন।

–প্রিয়ন্তি আমাকে বাবা বলে ডাক দিয়েছে? ফ্যাকাশে গলায় বললো জয়দেব। সে এখনো নির্মল বাবুর কাঁধের সাথে মাথা ঠেক দিয়ে আছে।

–হ্যাঁ, ডাক দিয়েছে। ঐ তো ওদেরকে এখনো দেখা যায়, ডাক দিবো? জয়দেবের কথা শেষ হতে না হতেই দ্রম্নত উত্তর দিলেন নির্মল বাবু। এমন একটি কথা শোনার জন্যই যেন তিনি গত কয়েকদিন ধরে অপেক্ষা করছেন। প্রিয়ন্তি তার বাবাকে ডেকেছে কিনা আসলে নির্মল বাবু শোনেনি।

–দিন, ডাক দিন। অস্ফুট স্বরে বললো জয়দেব। তার মুখ দিয়ে কথা যেন বের হচ্ছে না। নিজের কাঁধের উপর থেকে জয়দেবের মাথা সরিয়ে দিয়ে অতি দ্রম্নত কয়েক গজ সামনে এগিয়ে গেল নির্মল বাবু। ওদেরকে এখনো দেখা যাচ্ছে। গলায় তার যত জোর আছে সব প্রয়োগ করে নির্মল বাবু ডাক দিলো– প্রিয়ন্তি মা সবাই ফিরে আসো,সবাই ফিরে আসো। এলাকাটি যেন কেঁপে উঠলো নির্মল বাবুর ডাকে।

জয়দেবরা ছাড়া সবাই হতচকিত হয়ে গেল। জয়দেবরা ছাড়া তাদের ভাষা এখানে আর কেউ বুঝতে পারেনি। দু'জন ইমিগ্রেশন অফিসার এসে দু'পাশ থেকে দ্রম্নত নির্মল বাবুর হাত ধরে ফেললো। সে দিকে তার খেয়াল নেই। নির্মল বাবু দেখতে পাচ্ছেন ওরা ফিরে আসছে। তিনি উদ্বেগশূন্য কারণ প্রিয়ন্তিরা তার ডাক শুনতে পেয়েছে এবং তারা ফিরে আসছে। এরপর যা হবার হবে। জেল জরিমানা আর কতটুকু হবে?
–অৎব ুড়ঁ সধফ? একজন পুলিশ অফিসার জিজ্ঞাসা করলো নির্মল বাবুকে। তারা দু'জন নির্মল বাবুকে শক্ত করে ধরে রেখেছে।
– ঘড়,হড় ওস হড়ঃ সধফ.ওঃ ধিং ধ নরম সরংঃধশব. নির্মল বাবু দেখছে ওরা দ্রম্নত ফিরে আসছে এবং পুলিশ অফিসাররা ওদের আসার জন্য অপেক্ষা করছে। টাল–মাটাল অবস্থায় জয়দেব এতক্ষণে নির্মল বাবুর কাছে এলো। এতক্ষণে আরো কয়েকজন পুলিশ এসে নির্মল বাবুকে ঘিরে রেখেছে।
ওরা কাছে চলে আসতেই নির্মল বাবুকে একজন পুলিশ অফিসার জিজ্ঞাসা করলো– উড় ঃযবু ধিহঃ ঃড় মড় যড়সব?
–ণবং,ঃযবু ধিহঃ মড় যড়সব. পুলিশ অফিসাররা নির্মল বাবুর হাত ছেড়ে দিলো।
–বাবা! বলেই প্রিয়ন্তি বাবার গলা ধরে কেঁদে দিলো। একই সাথে জয়ন্ত ও পড়ন্ত বাবাকে ঝাপটে ধরলো। তিন ছেলেমেয়ের ভার সামলাতে না পেরে জয়দেব ফ্লোরে পড়ে গেল। একজন পুলিশ জয়দেবকে উঠে দাঁড় করালো।
–অৎব ুড়ঁ সধশরহম ধ সড়ারব? একজন পুলিশ জিজ্ঞাসা করলো নির্মল বাবুকে।
–ঘড়,হড় রঃ'ং হড়ঃ ধ সড়ারব.ণড়ঁ ফড় হড়ঃ শহড়ি যিধঃ রিষষ নব যধঢ়ঢ়বহরহম.এঁযধু সধফব ধ নরম সরংঃধশব.ওস ৎবধষষু ংড়ৎৎু. বললেন নির্মল বাবু।
–ঙক.ঙক.এবঃড়ঁঃ. কয়েক সেকেন্ড পরেই আবার পুলিশ অফিসারটি বললো–ডধরঃ,ডধরঃ বলে অফিসারটি কাউন্টার থেকে কয়েকটি ফরম নিলো এবং প্রত্যেকটিকে মধুমিতা, প্রিয়ন্তি, জয়ন্ত ও পড়ন্তের স্বাক্ষর নিয়ে বাইরে চলে যাবার নির্দেশ দিলো।

পড়ন্ত কখন যে লাফ দিয়ে বাবার কোলে চড়ে আছে সেটা বোধহয় কেউ খেয়ালই করেনি। নিজেকে সামলে নিলো জয়দেব। ছোটছেলের কপালে, গালে চুমো দিলো সে পাগলের মত। মেয়েকে কাছে টেনে কপালে চুমো দিলো, জয়ন্তকে গালে কপালে চুমো দিলো। মধুমিতা ও নির্মল বাবু শুধু দেখছে জয়দেব কী করছে। তারা কিছু করছে না। নির্মল বাবুর যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়েছে। নিজেকে তার মুসা ইব্রাহীম মনে হচ্ছে।
সবাই মিলে বাইরে এসে দাঁড়ালো। পড়ন্ত এখনো বাবার কোলে চড়ে আছে। প্রিয়ন্তি ও জয়ন্ত বাবার গা ঘেঁষে দাঁড়ালো। মধুমিতা এখনো মাথায় ঘোমটা দিয়ে আছে।

–নাম কোল থেকে। বুড়ো ছেলে কোলে চড়েছে। মধুমিতা ধমক দিল ছেলেকে।
–তুমি নামো। যাও তুমি এখান থেকে। কোলেই পড়ন্ত বাবার গালে একের পর এক চুমো দিতে থাকে। বাবার গলা সে আরো শক্ত করে ধরেছে।
–এবার নাম বাবা। জয়দেব ছেলেকে কোল থেকে নামাতে চেষ্টা করে।

–না নামবো না। নামলেই তুমি দেশে পাঠাইয়া দিবা। আমি দেশে যামু না। কিছুতেই যামু না । কৃত্রিমভাবে কাঁদতে চাইল পড়ন্ত ।

–নারে বাবা আর পাঠাবো না। নামো এবার। জয়দেব জোর করে ছেলেকে কোল থেকে নামিয়ে দাঁড় করিয়ে তার এক হাত বগলদাবা করে রখল। ভারী নিঃশ্বাস ত্যাগ করলো সে । হেরে গেছে সে মায়ার বন্ধনের কাছে ।

–শত্রুতা তো ভালোই উদ্ধার করলেন নির্মলদা, এবার কী করবেন? বললো জয়দেব। মুখে তার মৃদু হাসি ।

–তোমরা সবাই আমার গাড়িতে আসো। বাকিরা কীভাবে যাবে কে জানে। বলেই নির্মল বাবু প্রিয়ন্ত, জয়ন্ত ও পড়ন্তকে নিয়ে গাড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করলেন। জয়দেবের কথার কোনো জবাব দিলো না। বিজয়ের হাসি তার মুখে ।

–এই আর একজন যে থাকলো নির্মলদা? বললো জয়দেব। এবারো নির্মল বাবু কোনো জবাব দিলো না। তিনি এমন একটা ভাব ধরলেন যেন জয়দেবের কথা শোনেননি অথবা জয়দেবকে তিনি চিনেন না।

জয়দেব গাড়ির কাছে যাবার জন্য হাঁটা শুরু করলে মধুমিতাও স্বামীর পিছে পিছে হাঁটতে শুরু করলো।

প্রিয়ন্ত, জয়ন্ত ও পড়ন্ত নির্মল বাবুর গাড়ি এবং মধুমিতা স্বামীর গাড়িতে বাসার দিকে রওয়ানা দিলো। ডান হাতে সে শাড়ির আঁচল ধরে রেখেছে যাতে মাথার কাপড় সরে না যায়।

কিছুক্ষণ পর তাদের গাড়ি ফ্রিওয়েতে উঠলো। গাড়ি মোড় ঘুরাতেই হলিউডের পাহাড় দেখা গেল। প্রিয়ন্ত, পড়ন্ত, জয়ন্ত একসাথে চিৎকার দিয়ে উঠলো হলিউড, হলিউড। খুব সুন্দর তাইনা কাকা? প্রিয়ন্ত বললো।

–হুম। জবাব দিলেন নির্মল বাবু।

–বাবা আমাদেরকে কয়েকদিন নিয়ে গিয়েছিলো। প্রিয়ন্ত বললো।

– আবার নিয়ে যাবে। আবার সব দেখতে পাবে। নির্মল বাবু বললেন।

–আপনি এত ভালো কেন কাকা? সব তো আপনার জন্যই ঠিকঠাক হলো। মার বন্ধুগুলো ভালো না। মাকে খারাপ পরামর্শ দেয়। মা একটা বোকা মানুষ। প্রিয়ন্ত বললো। জয়ন্ত ও পড়ন্ত প্রাণভরে বাইরের দৃশ্য দেখছে। গত তিন বছর আর তাদের এদিকে আসা হয়নি। প্রথম তারা যেদিন আসে, সেদিন বাবার গাড়িতে করে বাসায় যেতে যেতে তারা এসব দৃশ্য দেখেছিল। ঝকঝকে, তকতকে, ছবির মতো সুন্দর চারদিক। আজ যেন আরো ভালো লাগছে।

–তুমি কী আমাকে ক্ষমা করেছো? স্বামীকে প্রশ্ন করে মধুমিতা।

জয়দেব স্ত্রীর কথায় কোনো জবাব দেয় না। আপন মনে সে গাড়ি চালাচ্ছে।

–বললে না আমাকে ক্ষমা করেছো কিনা? জানো তো বালির বাঁধ বেশিদিন টিকে না। বললো মধুমিতা।

–যে ক'দিন টিকে সেটাই বা মন্দ কি? স্ত্রীর দিকে না তাকিয়ে জবাব দেয় জয়দেব। বালির বাঁধের অর্থ বোঝে সে ।

লুকিং গ্লাসে নির্মল বাবুর গাড়ি পিছনে দেখা যাচ্ছে। নির্মল বাবু হাত দিয়ে জয়দেবকে ইশারা করছেন। জয়দেব বুঝতে পারে না তার ইশারা। এরপর জয়দেব গাড়ির গতি কমিয়ে দেয়। নির্মল বাবু পাশাপাশি লেনে এসে বলে সামনে যে ম্যাকডোনাল্ডের দোকান আছে সেখানে থামতে হবে, জরুরি কাজ আছে।

কোনো কথা না বলে জয়দেব নির্মল বাবুর গাড়ি অনুসরণ করে এবং একসাথে ম্যাকডোনাল্ডেরে পার্কিংলটে গাড়ি পার্ক করে ভিতরে গিয়ে সবাই বসে।

–এখানে নিয়ে এলেন কেন? নির্মল বাবুকে প্রশ্ন করলো জয়দেব।

–বসুন সবাই। কিছু খাবো। বলেই নির্মল বাবু কাউন্টারে গিয়ে ৬টি ফিস বার্গার ও কোকাকোলার অর্ডার দিয়ে ফিরে এলো। জয়দেব বা মধুমিতা কিছু বললো না। মধুমিতা এখনো মাথায় ঘোমটা রাখার চেষ্টা করছে।

–আপনার সংসার আরো কয়েকদিন আমার নির্দেশে চলবে। আপনার কোন আপত্তি আছে জয়দেবদা?

–আপত্তি আর থাকবে কি? যে শত্রম্নতা আপনি উদ্ধার করলেন–এ জীবনে কী আর সে ঋণ শোধ করতে পারবো? জয়দেব উত্তর দিলো। কল্পিত বিরহ এখনো তাকে আচ্ছন্ন কওে রেখেছে ।

–শত্রম্নর কাজ শত্রম্ন করবে, বন্ধুর কাজ বন্ধু করবে। আমার কাজ আমি করবো। ইতোমধ্যে ওয়েটার ফিস বার্গার এনে টেবিলে রেখে গেল। সবাই কোকাকোলা আগেই নিয়েছে।

নির্মল বাবু নিজেরটা হাতে নিয়ে প্রিয়ন্তি, জয়ন্ত ও পড়ন্তকে ইশারা করলো তার সাথে অন্য টেবিলে চলে যাবার জন্য। তারা ফিস বার্গার হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো।

–এই শত্রম্নটাকে নিচ্ছেন না কেন? স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে নির্মল বাবুকে বললো জয়দেব। মধুমিতা চুপচাপ। সে ক্লান্ত তবে বিমর্ষ নয়। মায়াবি দৃষ্টিতে সবার দিকে তাকাচ্ছে।

–তাহলে আর শত্রম্নতা উদ্ধার করি কীভাবে? বললাম না, আরো কয়েকদিন সব কিছু আমার নির্দেশে চলবে। বলেই ওদেরকে নিয়ে নির্মল বাবু অন্য টেবিলে চলে গেলেন। খাওয়া শেষে সবাই আবার এক সাথে হলো।

–এখন বাসায় গিয়ে সবাই একটানা ঘুম। বিকালে আমার ইচ্ছে মতো কাছের কোনো বাংলাদেশি রেস্টুরেন্টে সবাই একসাথে খাবো। দেখি আমাকে কে ঠেকায়। আগামীদিন থেকে সবকিছু নতুন করে শুরম্ন। মেঘের চেয়ে ঝড়টাই বেশি হয়েছিল। বাবারে বাবা, এক মিনিটের ব্যবধানে কী সর্বনাশটাই না ঘটে যাচ্ছিল। বললেন নির্মল বাবু।

"আগামী দিনের আশা–ভরসা কত না মধুর ছবি
ফুটিয়া উঠিছে আঁখির পাতায় ডুবেছে যখন রবি।"

–কবিতাটি খুব মনে পড়ছে নির্মলদা। জয়দেব বললো।

–ভালো, খুব ভালো। কবিতার চরণে আশ্রয় নিলো শান্তি পাওয়া যায়। আমরা আগামীদিন থেকে শান্তি অন্বেষণে যাত্রা শুরম্ন করবো। বৌদির জন্য ফার্মেসিতে খুঁজবো রাগ কমানোর কোনো টিকা পাওয়া যায় কিনা। রহস্যময় হাসি নির্মল বাবুর মুখে ।

মৃদু হাসির ঝিলিক দেখা দিলো মধুমিতার ঠোঁটে। –টিকার আর দরকার হবে না বোধহয়। দীর্ঘ নীরবতার পর কথা বললো মধুমিতা। হেসে দিল সে ।

–লোকজন বলে যত গর্জে তত বর্ষে না। আমার তো মনে হয় মাঝে মাঝে যত বর্ষে ততটা আগে গর্জে না। সে জন্যই বলেছিলাম মেঘের চেয়ে ঝড়টাই বেশি হয়েছে। বাবারে বাবা । চলেন বের হই। নির্মল বাবু বললেন।

মধুমিতা এখনো মাথায় অর্ধেক ঘোমটা দিয়ে ডান হাতে শাড়ির আঁচল ধরে রেখেছে। নির্মলবাবু প্রিয়ন্তি, জয়ন্ত ও পড়ন্তকে নিয়ে গাড়িতে উঠেছেন।

মধুমিতা গাড়িতে সামনের সিটে বসার সময় জয়দেব বললো–তোমাকে মধুমিতার মতো লাগছে।

স্বামীর চোখের দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকালো মধুমিতা। স্বামীর কথার কী অর্থ সে বুঝলো সেটা কেবল মধুমিতাই জানে।

পাশাপাশি লেনে গাড়ি দু'টো বাসার দিকে ছুটছে।

***

লিটল বাংলাদেশ
–লস এঞ্জেলেস
০৬/১০/২০১০